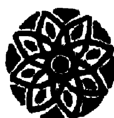
নাগপাশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

পরিবেশক :—
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২।



প্রথম প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৬০।
প্রকাশক—শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
তিন টাকা

১

কত কথাই মনে হয়!

কথাই কি মনে হয়? মন কি কথা দিয়ে ভাবে? ভাব থেকে ভাবনা পর্য্যন্ত সবই কি রূপ নেয় কথায়?

কালিদাসের সেই অপরূপ উপমাটিই আজ বার বার নরেনের মনে পড়ে। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের একতাকে বাক্য ও অর্থের চিরন্তনী অবিচ্ছন্নতা হিসাবে কল্পনা করা।

মানে ছাড়া কথা নেই। কথা ছাড়া মানে নেই।

কিন্তু মন?

মনেরও কি কথা ছাড়া গতি নেই? এটাই মনের শেষ মানে দাঁড়ায়?

হঠাৎ যেন সচেতন হয়েই নরেন নিজের মনে একটু হাসে।

মনোবিজ্ঞানের এত মোটা এমন বিখ্যাত একটি বই শেষ করে আনমনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তাটা শেষে এইখানে এসে ঠেকলো!

লক্ষ্যভেদ করে অর্জ্জুনের লাভ হয়েছিল দ্রৌপদী। মনের রহস্য ভেদ করে তার কি লাভ হল?

মানসিক একটু সুখ?

সকালবেলা ধরণীর বাড়ীর রোয়াকটুকুতে দাবার ছক পেতে বুদ্ধির যুদ্ধে নেমে, ধরনী আর অবিনাশ কিস্তিমাতের যে সুখ আশা করছে?

কয়েকজন এক মনে তাদের লড়াই দেখে সুখের যে অংশ ভাগ পাচ্ছে?

তা ছাড়া কোন মানে হয় না তার বই পড়ার জ্ঞান চর্চ্চা করার। সত্যই তো, আর কিছু করার নেই সামান্য চাকরীটা করা ছাড়া, তাস পাশা দাবা কিম্বা নিছক

হাসি গল্পের আড্ডা তার ভাল লাগে না, বই পড়ে তবু উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন জীবনটার কথা ভুলে থাকতে পারে, সময় কাটে।

লোকে ভাববে, জ্ঞান লাভের জন্য কি আগ্রহ তার, কি সাধনা! জ্ঞানের সাধক বিখ্যাত জ্ঞানীর প্রাণের ছোঁয়াচটা তার প্রাণেও লেগেছে।

রাত জেগে বইটা পড়েছিল। বেশী রাত পর্য্যন্ত না হলেও আলো নিভিয়ে শুতে এগারটা বেজে গিয়েছিল বৈকি। পরীক্ষা পাশের পড়া যারা করে, পাড়ায় তারাও তখন রাত্রির সাধনা সাঙ্গ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম হয়ে গিয়েছে চারিদিক।

দিনে যে শব্দ ওঠে না, উঠলেও কাণে পৌছায় না, মাঝে মাঝে সেই সব শব্দেই শুধু সাড়া দিয়েছে, জীবন্ত মানুষ ও প্রাণীর পৃথিবী—এই পাড়াটুকু।

ভোর চারটেয় উঠে আবার বইটা পড়তে সুরু করেছিল। তবে ঘুমন্ত পৃথিবীতে একা জ্ঞানলাভের সাধনা করার গর্ব ভোর রাত্রে বজায় থাকেনি। চোখে পড়েছিল প্রতিবেশীর ঘরের জানালার ফাঁকের আলো। কানে এসেছিল বাঁধা সুরে শব্দ করে পরীক্ষার পড়া আবৃত্তি করার অস্পষ্ট অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ।

পরীক্ষা পাশ করতে হবে না, তবু রাত জেগে আর রাত থাকতে উঠে বই পড়ে,—মোটা বই, কঠিন বই।

লোকে তো ভাববেই সে জ্ঞানের মস্ত বড় সাধক।

কিন্তু নিজে তো সে জানে, কেন তার পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই পড়া!

না:, বিদ্যার জন্য জ্ঞানের জন্য বই পড়ার সে আগ্রহ তার নেই।

গ্র্যাজুয়েটত্ব লাভ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে আশী টাকার একটা চাকরীতে গাঁথা হয়ে গিয়ে জ্ঞানী হবার বিদ্বান হবার সাধ, তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

এ তো জানা কথাই যে আর হবে না, জ্ঞান-চর্চ্চা এখন তার কেবলমাত্র অবাস্তব মানস-চর্চ্চা।

শেখার জন্য জানার জন্য কি সীমাহীন আগ্রহ আর ব্যাকুলতাই তার ছেলেবেলা থেকে ছিল।

লেখা পড়া শেখার সে কষ্টকর ইতিহাস মনে করলে আজ গা জ্বালা ত করে, হাসিও পায়!

সমগ্র বাস্তবতা ছিল তার বিদ্যালাভের বিরুদ্ধে, তবু সে নিজে চেষ্টা করে গায়ের জোরে বিদ্বান হবে!

বুদ্ধি ছিল, আকাংখা ছিল, চেষ্টা ছিল। স্ক্রু বল্টু আলগা হয়ে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া সেকেলে একটা ধীর মন্থর পরিবারের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শেখার জন্য, জ্ঞানলাভ করার জন্য, তার সক্রিয় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকে তারিফ করত।

বলত, এ ছেলে একদিন মস্ত বড় বিদ্বান হবে, মস্ত বড় লোক হবে, মোটা মাইনের চাকরী করবে।

কিভাবে বাধা পেয়ে অসাধারণত্ব ঘুচতে ঘুচতে একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল বিদ্যালাভের সেই কামনা বাসনা।

চাকরী পেয়েছে? এই বাজারে যেমন হোক একটা চাকরী! লোকে তাই বলে। বাড়ীর লোকে তো আরও বেশ জোর দিয়ে বলে। কত বেকার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা চাকরীর জন্য, তার বন্ধু নন্দন আজ পর্যন্ত কিছু যোগাড় করতে পারল না।

সে একটা চাকরী পেয়েছে!

পরীক্ষা পাশের পুরস্কার শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এই, বেকারদের সঙ্গে তুলনায়। প্রথম বয়সটা গেল পরীক্ষা পাশ করার ধাক্কায়, বাকী জীবনটা কাটবে জেলখানার কয়েদীর মত কলম পিষে।

তাও পরের জন্য।

খাওয়াপরা হাত খরচের জন্য পরের কাছে হাত পাততে হয় না, নিজের তার শুধু এই গর্বটুকু সম্বল।

আজ ছুটির দিন।

মাধবকে বইটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে। একটু আলোচনা ও তর্কও করে আসবে।

শিষ্যের মতই করবে অবশ্য। অতবড় বিদ্বান লোকটার শিষ্য হবার যোগ্যতাও বুঝি সে এত সাধ নিয়েও অর্জন করতে পারে নি।

বিদ্যা আর জ্ঞানই আদর্শ মানুষটার

অথচ ওই আদর্শবাদী বিদ্যা-পাগল মানুষটাকেও কত সামান্য টাকার জন্য চাকরী করে খেতে হয়, কত অমূল্য সময় আর শক্তি বিক্রী করতে হয়!

ছুটির দিনও ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে পড়ার কামাই নেই। আশে পাশে কয়েকটা বাড়ী থেকে কত রকমের গলাই যে কাণে ভেসে আসে।

বাড়ীতে পড়ছে বরেন।

পড়ে খুব, কিন্তু মাথা নেই। কোনরকমে পরীক্ষা পাশ করার বেশী কিছু ওর পক্ষে অসাধ্য।

মাথা থাকাটাই অবশ্য আসল কথা নয়।

মাথা থাকলেই যেন সবাই মাধবের মত কৃতিত্ব দেখাতে পারে পরীক্ষা পাশ করায়, তার মত পণ্ডিত হবার সুযোগ পায়।

দীননাথের ছেলেটা কি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ই দিয়ে আসছিল স্কুলের পরীক্ষা পাশ করায়। অল্প শিক্ষিত গরীব একজন দোকান-কর্মচারীর প্রায় অশিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়েও ছেলেটার পরীক্ষা পাশের অদ্ভুত ক্ষমতায় মানুষ অবাক হয়ে থেকেছে। কেউ বলেছে এটা প্রকৃতির খেয়াল, কেউ বলেছে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, কেউ বলেছে পূর্বজন্মের বিদ্যা অর্জনের জের।

মাধবও এই স্কুলে পড়েছিল। আজ পর্য্যন্ত তারটাই রয়ে গেছে স্কুলের সেরা ছাত্রের রেকর্ড।

মণ্টু এই রেকর্ড ভাঙতে পারে এমন কথাও কেউ কেউ ভেবেছে।

কিন্তু ঘরে বাইরে অনেককে থ' বানিয়ে দিয়ে শেষ ক্লাশে উঠবার পরীক্ষায় সে হয়ে গিয়েছিল থার্ড !

নিজের অসুখ-বিসুখ বা বাড়ীতে কোন বিপদ-আপদ, এ রকম কোন কারণই ঘটে নি।

বরেনের কাছে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হতে চায় নি। বরাবর যে শুধু প্রথম হয়েই পাশ করে নি, দ্বিতীয় জনের সঙ্গে ব্যবধান বজায় রেখে এসেছে একরাশি নম্বরের—তার এ কি রকম ধপাস্ করে অধঃপতন ঘটা !

সকালে নরেন গিয়েছিল ব্যাপার বুঝতে। দীননাথ আর মণ্টুর সঙ্গে সবে কথা সুরু করেছে, বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল হেডমাষ্টার হৃদয়বাবু।

পরীক্ষা দিয়ে মণ্টু একদিনও স্কুলে যায় নি। হৃদয় তাই নিজেই ব্যাপার বুঝতে এসেছিল।

'এটা কিরকম ব্যাপার হল তোমার ?'

'জানি না স্যার। বুঝতে পারছি না।'

হৃদয় গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'আমি বুঝেছি ব্যাপার। লেখাপড়ায় ঢিল দিয়ে অন্যদিকে মন দিয়েছ। অহঙ্কার বেড়ে গেছে তোমার, এত ভাল ছেলে, বেশী না পড়লেও ফার্ষ্ট হয়ে যাবে।'

'লেখা পড়ায় একটুও ঢিল দিই নি স্যার। পড়ার সময়, বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।'

দীননাথ সায় দিয়ে বলেছিল, 'হাঁ, আগের চেয়ে বেশী পড়ে আজকাল।'

'আজ স্কুলে যাবি !'

বলে হৃদয় গম্ভীর মুখেই চলে গিয়েছিল।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দীননাথ হাসিমুখে বলেছিল, 'এত ভড়কে যাবার কি হল ? এরকম হয়ে যায় দু'একবার।'

নরেন বলেছিল, 'উঁহুঁ, তা বললে হবে না। হয়ে তো যায়, কিন্তু কেন হয়ে

যায় ? যাই ঘটুক তার একটা কারণ থাকবে তো। মণ্টুর পরীক্ষা খারাপ হবারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

'মণ্টু বলে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝবার চেষ্টা করা যাক এসো। বরাবর পরীক্ষা ভাল হয়েছে, এবার অন্য রকম হল কেন ? ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে সে কথা ভুলে যাও, শুধু ধরে নাও ফলটা অন্যরকম হয়েছে। কেন হয়েছে ?'

দীননাথ ও মণ্টু দু'জনেই তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল।

'রেজাল্ট বদলাতে পারে কি করে ? দু'রকমভাবে এটা সম্ভব। যে পরীক্ষা দেবে সে যদি বদলে যায় কিম্বা তার পড়াশোনা করার রকমটা যদি বদলে যায়। তোমার যখন কিছুই হয় নি বলছ, মনোযোগ দিয়ে আরও বেশী সময় পড়েছ বলছ—তা হলে ধরে নেওয়া যায়, তুমি বদলাও নি। এ্যাদ্দিন যেভাবে পড়ছিলে তাতে নিশ্চয় কোন একটা গোলমাল হয়েছে।'

আরেকটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে এসেছিল কারণটা। খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মণ্টুর থার্ড হওয়ার রহস্যের বাস্তব মানে।

মণ্টুর বন্ধু সমীর। মণ্টু অসাধারণ ভাল ছেলে বলেই অবশ্য বন্ধু। তাদের দুজনের বাড়ীতে তফাৎ অনেক।

সমীরদের শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবার। তার দিদি রমলা কাউকে বিয়ে করার বদলে স্কুলে টিচারি নিয়েছিল। সকালে সে ভাইকে পড়াত।

মণ্টু হাজির থেকে তার পড়ান শুনত—চুপ চাপ শুনত! শোনাই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট।

কারণ সাধারণ ছাত্র সমীরকে রমলা এমনভাবে পড়াত যেন তার মাথাটা মণ্টুর মাথার মতই সাফ।

তা ছাড়া মাঝে মাঝে নিজে থেকে মণ্টুকে এটা ওটা প্রশ্ন করে তাকে পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগও দিত।

তারপর হঠাৎ একদিন রমলা দীনেশকে বিয়ে করে চলে গেল স্বামীর ঘরে।

সমীর ও অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যত টাকা খরচ করা দরকার তার অনেক বেশী খরচ করতেও কোন অসুবিধে নেই সমীরের বাবার। অন্য ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট পড়াবার জন্য মাষ্টার ছিল, তবু সমীরের জন্য ভিন্ন একজন মাষ্টার রাখা হয়েছিল।

রমলার ছিল খানিকটা খেয়াল, খানিকটা স্নেহ। এমন চটপট কঠিন পড়া বুঝে নিত মণ্টু যে ভাইকে উপলক্ষ করে তাকে পড়াতে সে আনন্দ পেত। কিন্তু একজন তার নিজের ছেলেকে পড়ানোর জন্য মাইনে দিয়ে মাষ্টার রাখলে কি করে তার পড়ানো শুনতে যাওয়া যায়?

একপাশে বসে চুপচাপ শুনতে চাইলেও?

নবেন সব শুনে বলেছিল, 'তবে? সমীরের দিদি খুব যত্ন নিয়ে ভাল করে পড়াতেন না?'

'জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন।'

'তবে? একজন টিচার নিজের ভাইকে পড়ানোর সঙ্গে তোমাকেও দরদ দিয়ে সব জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন—তুমি রোজ তা শুনতে। সেটা বন্ধ হলে ফল ফলবে না? তুমি নিজে নিজে পড়ে ফার্ষ্ট হবে—তাই কখনো হয়? কেউ তা পারে না। যতই মাথা থাক, শুধু স্কুলে পড়ান শুনে পরীক্ষায় থার্ড ফোর্থ হওয়ার চেয়ে ভাল রেজাল্ট করা যায় না।'

মণ্টু বিহ্বলের মত বলেছিল, কেন? আমি তো সব বুঝতে পারি!'

'তা পারবে না? স্কুলে সাধারণ ছেলেদের সাধারণ পাশের পড়া পড়ানো হয়, সে তো তুমি বুঝতে পারবেই! ফার্ষ্ট হতে হলে আরও বেশী করে, কঠিন করে পড়ানো বুঝতে হয়, অনেকরকম ছোটবড় কায়দাকানুন জানতে হয়, শিখতে হয়। একি সস্তা লেখাপড়া পেয়েছ, শুধু স্কুলে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ফার্ষ্ট হয়ে যাবে!'

দীননাথ কথাটা বুঝেও কাতরভাবে একটা প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু কথাটা কি রকম হল? কত ছেলেকে বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ানো হয়, তাদের মধ্যে কতজনা ফেল করেও যাচ্ছে তো?'

নরেন বলেছিল, 'তা যাচ্ছে বৈ-কি। শুধু মগটা মাষ্টার রাখলেই আবার হয় না, ছেলেমেয়ের পাশ করার ক্ষমতাটাও থাকা চাই।'

মণ্টু হঠাৎ বলেছিল, 'আমি সমীরকে ধরব, ওর বাবাকে বলে কয়ে রাজী করাব। মাষ্টারের পড়াবার সময় একপাশে বসে চুপ চাপ শুধু শুনব—একটি কথা বলব না, টুঁ শব্দটি করব না।'

নরেন আর কিছু বলে নি।

সে জানত ওরকম ব্যবস্থা করে নিতে পারলে কিছু উপকার হয় তো মণ্টু পাবে কিন্তু আসল কাজ হবে না।

সমীরের মাষ্টার তাকে পড়াবে সাধারণ পাশের পড়া, সে পড়ানো শুনে মণ্টুর ফার্ষ্ট হবার স্থবিধা বিশেষ কিছু হবে না।

পড়ানো শোনার ব্যবস্থা মণ্টু করেছিল।

সমীর বাপের আদুরে ছেলে, সে নাকি বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে মণ্টুকে সাথে নিয়ে পড়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে, সে কাছে না থাকলে তার কিছুতেই পড়ায় মন বসে না।

ভুবন মণ্টুকে অনুমতি দিয়েছিল।

কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় নি। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় মণ্টু আবাব থার্ড হয়ে গেছে।

যোগেশের বাড়ীর পাশের সরু গলি দিয়ে পিছন দিকে দীননাথের বাড়ী।

মাধবের বইখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে নরেন মণ্টুকে ওই সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। কয়েকটি ছেলে মার্বেল খেলছে—মণ্টুর আজ খেলায় মন নেই।

'খবর কি মণ্টু?'

মণ্টু বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে।

চলতে চলতে নরেন ভাবে, সে ইচ্ছা করলে ওকে ফার্ষ্ট করিয়ে দিতে পারে।

অলস অর্থহীন মানস-চর্চা স্থগিত রেখে তার সিকি ভাগ সময়ও যদি সে খরচ করে ওর পেছনে—টেষ্টে আবার ও কাষ্ট হবে।

স্কুল ডিপ্লোমার পরীক্ষাতেও আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারবে।

কিন্তু তারপর ?

তারপর কি হবে মন্টুর অসাধ্য সাধনের চেষ্টার ? কে তাকে পরের পরীক্ষাগুলির জন্য তৈরী করবে ?

সকাল প্রায় ন'টার সময় মাধব বই থেকে মুখ তোলে।

মানসী কথা বলার সাহস ও সুযোগ পায়।

মাধবকে দেখেই এখন টের পাওয়া যায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে তন্ময় হয়ে পড়ার ঘোরটা তার কেটে গেছে।

'সারারাত পড়েছো—'

মানসীর স্বরটা রাগ আর অভিমান মেশানো অনুযোগের।

'সারারাত ? তুমি সারারাত জেগে থেকে আমায় পড়তে দেখেছো নাকি ?'

'এগারোটায় শুলাম, দেখলাম পড়ছ। পাঁচটায় উঠলাম, তখনও দেখলাম পড়ছ। সেই একভাবে বসে। সিগারেটের ছাই যা জমেছে দেখছি একটা উনানের ছাই-এর চেয়ে কম হবে না। এসব দেখে মনে হবে না, তুমি হয় তো সারারাত ঠায় জেগে পড়েছ ?'

'তা মনে হতে পারে বটে !'

'তামাসা করছি না।'

'নিশ্চয় না।'

মানসী আলগা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দেয়।

'ন'টা বাজে। ভোরে চারু উনানে আঁচ দিয়ে গেছে, সেই থেকে নিজের মনে উনান জ্বলছে। শুধু কয়লা চাপিয়ে যাচ্ছি। চারবার না পাঁচবার শুধু তোমার চায়ের জল ফুটল, ব্যাস্।'

'কেন ?'

'কাল রেশন আনো নি ! আজ এখনো বাজার এলো না। থলি খালি ঝুড়ি খালি, উনানে চাপাব কি ?'

'এতক্ষণ বলো নি কেন ?'

মুখে শুধু একটা বিষণ্ণ কাতর নালিশের ভঙ্গি ফোটে মানসীর। মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না।

মাধব শেষ সিগারেটটা ধরায়।

মানসীর মুখের ভঙ্গি আর নীরবতা দুয়ের মানেই সে জানে। তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে দেখে কিছু বলতে মানসী সাহস পায় নি।

বই বন্ধ করে সমাহিতের মত চিন্তা করার সময়ও, রেশন আর বাজারের কথা জানাতে সাহস পায় নি।

প্রত্যেকবার না হোক, ওই অবস্থায় ডাকলে,কি প্রচণ্ড রাগটাই যে মাঝে মাঝে মাধব দেখায় !

সচেতন হয়ে নিজের মনে তাকে হাসতে দেখে, এদিক ওদিক চাইতে দেখে, কথা কইতে গেলেই আর তার বোমার মত ফেটে পড়ার সম্ভাবনা নেই জেনে, মানসী সাহস করে তাকে রেশন আব বাজারের প্রয়োজনটা জানাতে এসেছে।

রাগ আর অভিমান দেখাতেও সাহস পেয়েছে।

মানসীর মর্ন না যোগাক, তার মন সে জানে।

এমনি তাকে সে মোটেই ভয় করে না। তার সাধারণ রাগ বা ধমকের কোন তোয়াক্কা রাখে না। মানসী ভাল করেই জা'ন যে সজ্ঞানে যতই রাগুক তাকে ধমক দেবার সাহস মাধবের হবে না।

তর্ক করবে ঝগড়া করবে রাগারাগি করবে—তার সঙ্গে সমানভাবে করবে। তার বেশী নয়।

কিন্তু পড়া আর চিন্তা করার সময় অন্য এক জগতে তলিয়ে গিয়ে সে হয়ে যায় একেবারে অন্য মানুষ।

সে যেন কুকুর বেড়াল, এমনিভাবে তার উপর মাধব খেঁকিয়ে উঠতে পারে শুধু তখন, যখন সে তন্ময় হয়ে পড়ে কিম্বা খাতায় নোট লেখে কিম্বা একদৃষ্টে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভাবে।

পাগলের মত তার ওরকম খেঁকিয়ে ওঠাকে মানসী কেন ভয় করে, ওরকম অসভ্য আচরণ কেন চুপচাপ সহ্য করে যায়, সহজভাবে কথাবার্তা চলার সময় ওই ধমকানির কথা উল্লেখ করে একটু অনুযোগ অভিযোগ পর্য্যন্ত সে কেন জানায় না, তাও মাধবের অজানা নয়।

পড়া আর ভাবা নিয়ে তার ওরকম তন্ময় হতে পারাকে মানসী শ্রদ্ধা করে, মুনি ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার মত ওসময় বিরক্ত করলে, তার একেবারে ক্ষেপে উঠে তাকে ভস্ম করে ফেলতে চাওয়া সঙ্গত মনে করে। বোমার মত ফেটে পড়ে' গাল দিয়ে তাকে যে মাধব প্রায় মারতে উঠতে পারে এটাই তার কাছে সব চেয়ে অকাট্য প্রমাণ যে মাধবের জ্ঞানচর্চ্চায় ফাঁকি নেই, সত্যই জ্ঞানের জন্য তার অকৃত্রিম সাধনা।

নাওয়া খাওয়া ভুলে যাওয়া, একাসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া, কোন কোন রাত্রে ঘুমকে সম্পূর্ণ বর্জন করা, এসবের চেয়েও ওটাই বড় প্রমাণ। কত বড় কত দামী চিন্তায় কত ব্যাঘাত ঘটলে, তবেই না একটা মানুষ ওভাবে রেগে উঠতে পারে।

অন্য কেউ নয়, তার উপরে রেগে উঠতে পারে!

মাধব অসাধারণ মানুষ বৈকি।

সে জন্য মানসী হয়তো গর্ব্বও বোধ করে মনে মনে।

'খুব রাগ হয়েছে, না?'

'আমার আবার রাগ।'

'অভিমান? অপমান?'

'ন'টা কিন্তু বাজল।'

মাধব স্বর পাল্টায়।

'আচ্ছা, চুপ করে বসে না থেকে একটা কার্ডের রেশন নিজে আনতে পারতে না? কাছেই তো দোকান। ভাত সেদ্ধ হতে ঘণ্টা দেড়েকের কম লাগে না, ভাতটা হয়ে থাকত। সত্যি করে বলতো, রেশনের দোকানে যেতে লজ্জা করে, না অপমান বোধ হয়?'

'কিছুই হয় না। কত বাড়ীর মেয়েরা রেশন আনছে।'

'তবে আনো নি কেন?'

'উপায় ছিল না বলে। শুধু কি চা? বারে বারে কত কি হুকুম চালাও খেয়াল তো থাকে না। বই থেকে মুখ পর্য্যন্ত তোল না। এটা দাও, ওটা কর— সঙ্গে সঙ্গে না হলেই তো আমার দফা নিকেশ।'

না, তেমন ঝাঁঝ নেই মানসীর কথায়।

মাধবের জ্ঞানের সাধনায় সেও যে কাজে লাগে এটা জানিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে সে যেন খুসীই হয়েছে মনে হয়।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে মানসী বলে, 'হয়েছে আজ রেশন আনা বাজার করা!'

'কে?'

'নরেন বাবু!'

মাধব হেসে বলে 'ভয় নেই, তোমার দায় না সেরে বসব না। তোমরা গল্প কর, আমি ঘুরে আসছি।'

নরেনের মুখের স্বভোবিক রুক্ষতার ছাপটা আজ আরও বেশী স্পষ্ট মনে হয়। বোধ হয় দাড়ি না কামানো আর চুলে তেল না দেবার জন্য। রাত জাগার জন্যও হতে পারে।

একতলার ভাড়াটে অনাথের মেয়ের জিম্মা থেকে মাধবের ছোট ছেলেকে

সে কোলে করে এনেছিল, মানসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মায়ের কাছে আসবার জন্য কাঁদছিল। কিছুতে ভুলবে না তবু বেলা ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। মেয়েটা কি? এটুকু বুদ্ধি নেই যে মা'র জন্য কাঁদছে, মার কাছে দিয়ে আসি? আমি জোর করে কেড়ে নিয়ে এলাম।'

মানসী বলে, 'ওর দোষ নেই। আমিই ওপরে আনতে বারণ করেছিলাম—বলেছিলাম আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

নরেন আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

'কেন?'

'ছেলে কাঁদলে ওনার কাজের ব্যাঘাত হয়, চটে যান।'

নরেন বলে, 'ও!'

তারপর বলে, 'তাহলে মেয়েটাকে খুব ভালই বলতে হবে, এমনি পরের ছেলে সামলায়।'

মানসী একটু হাসে।—'বিনা স্বার্থে কি আর সামলায়?'

'ওর স্বার্থটা কি?'

'পড়া বলে দিই, গান শেখাই। নইলে ওর কিসের গরজ এতক্ষণ আমার ছেলে সামলাবে?'

নরেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাধবের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব নির্বিকারের মত বলে, 'ও কাঁদলে চটে যাই নাকি? তাতো আমি জানতাম না!'

মানসী বলে, 'জানবে কি করে? কেন চটে যাও পরে তো আর মনে থাকে না তোমার। কাজের সময় খোকা কেঁদে উঠলে আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাই, নয়তো নীচে দিয়ে আসি।'

নরেনের সামনে এ প্রসঙ্গের জের টানতে চায় না বলেই বোধ হয় টেবিলে সন্ত শেষ করা মোটা বইটার দিকে একনজর তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে মাধব

তাকে বলে, 'আপনাকে একটু বসতে হবে। আপনারা কথা বলুন, আমি বাজার আর রেশনটা নিয়ে আসি।'

নরেন বলে, 'বাজার আবার রেশন! অনেক টাইম লাগবে যে? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, আমি একটা সারি আপনি আরেকটা সারুন।'

মাধব বলে, 'অতি উত্তম প্রস্তাব।'

মানসী হেসে বলে, 'আমার সঙ্গে গল্প করার চেয়ে বাজার করা রেশন আনাও বুঝি ভাল লাগে?'

নরেনও হেসে বলে, 'দরকার পড়লে লাগে বৈকি! আপনার সঙ্গে গল্প করলে আপনার সময় নষ্ট, আপনার কাজটা করে দিলে বরং আধঘণ্টা সময় বাঁচবে।'

'আমার কাজ!'

'আপনার জন্যেই তো। নইলে মাধববাবুর কি আর বাজার করা রেশন আনার গরজ থাকত? হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসতেন।'

মাধব প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'মোটেই তা নয়। উনি বাপের বাড়ী গেলে আমি নিজে রান্না করে খাই।'

নরেন বলে, 'বৌদি তাহলে বাপের বাড়ীও যান? দু'একদিনের জন্য বোধ হয়?'

রেশনের সোজা হিসাব, বাড়ীর বাজারের হিসাবটা মাধব ভাল জানে—মাছ তরকারী কি আনতে হবে, কতটা আনতে হবে। মাধব তাই থলি হাতে বাজারে যায়, নরেন যায় রেশন আনতে।

রেশন হপ্তার তিন দিন চলে গেছে। আপিস খোলা, বেলাও হয়েছে। দোকানটাও কাছেই। প্রার্থী কম থাকায় মাধবের অনেক আগেই নরেন রেশন নিয়ে ফিরে আসে।

বলে, 'দেখলেন তো, কি রকম পাকা হিসেব। রেশন আনাও হল, গল্প করার সময়ও পেয়ে গেলাম।'

'আপনি হিসেবী মানুষ, সব দিক বজায় রাখতে পারেন।'

'খোঁচা দিলেন মনে হচ্ছে?'

খোঁচাই দিয়েছি।'

'কারণ?'

'কারণ আপনি সত্যি ভারি হিসেবী। ওঁর কাছে আপনি কি শিখছেন শুধু নামটাই জানি—কেন শিখছেন তাও বুঝিনে। যখন তর্ক করেন, কিছুই মাথায় ঢোকে না। কিন্তু আমি দেখেছি, উনি চটে উঠতে গেলেই আপনি ভারি চালাকি কায়দায় তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। কি বলেন তা বুঝি না কিন্তু আপনার চালাকিটা বুঝি।'

নরেনের রুক্ষ মুখে হাসি দেখা যায় কদাচিৎ, সস্মিত স্নিগ্ধ তামাসা দুষ্টামি ইত্যাদি নানা ধরণের নিঃশব্দ হাসি সে যেন ফোটাতেই জানে না অথবা তার মুখে আসেই না ওসব হাসি। সে যে হাসতে জানে মাঝে মাঝে তার হো-হো শব্দে ফেটে পড়া প্রচণ্ড হাসিতে তা টের পাওয়া যায়—গত বছর তিনেকের মধ্যে মাত্র কয়েকবার হলেও তার হাসির চোটে এ বাড়ীটা যেন কেঁপে উঠেছে, নীচের তলার ভাড়াটেদের অংশ পর্য্যন্ত!

আজই যেন প্রথম বিস্ময়ে উত্তাপে গলে তার মুখে স্নিগ্ধ স্নেহময় হাসির নীরব ব্যাঞ্জনা দেখা যায়।

তার মুখে এরকম হাসি মানসী আজ পর্য্যন্ত ছাখে নি।

'আপনি এত মন দিয়ে আমাদের তর্ক করা ছাখেন? তর্কের মানে বোঝেন না, তর্ক করাটা দেখতে এত ভালবাসেন? মাধববাবু চটে উঠলে তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা আপনার চালাকি মনে হবে—কিন্তু কোনরকম সস্তা চালাকি সত্যি ওটা নয়।'

'কেন নয়? আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি ওনার মেজাজ একটু চড়ে গেলেই আপনি আর জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। উনি নরম হয়ে যা বলেন তাই মেনে নেন।'

'মেনে নিই না। চুপ করে শুনে যাই।'

'তার মানেই মন যোগান, তোষামোদ করেন। সেটাও ভারি চালাকি করে করেন। প্রথমে এমনভাবে দেখান যেন আপনার একটা খটকা লেগেছে, ভুল হয়েছে কি না আরেকবার ভেবে দেখছেন। তারপর আস্তে আস্তে নরম হতে হতে একেবারে চুপ হয়ে যান। অর্থাৎ উনি যেন না ভাবেন যে ওঁর রাগ দেখে চুপ করেছেন, ওঁর কথাটা মেনে নিয়েছেন ভেবে উনি যেন খুসী হন।'

নরেন খুসী হয়ে বলে, 'আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা পালটে গেল। এবার বুঝতে পেরেছি কোন গুণে আমার গুরুটিকে দিনের পর দিন সামলে চলেন—শুধু সয়ে গিয়ে নয়।'

'তবে ?'

'কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে। তলিয়ে না বুঝলে কাণ্ডজ্ঞান জন্মায় না। তলিয়ে বুঝতে হলে বুদ্ধি দরকার হয়। এই বুদ্ধিটুকু আপনার আছে জানা গেল। আমার বেলা মাধববাবু যেমন বুঝতে পারেন না আমি মানিয়ে চলছি, মত মানছি না—আপনার বেলাতেও বুঝতে পারেন না যে, আপনি ভয় করেন না, মানিয়ে চলেন।'

কথা বলতে বলতেই মানসী দায় সামলাচ্ছিল। ছেলেকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখে, জরে নিঝুম বছর সাতেকের মেয়েকে একদাগ রঙীন মিক্‌শ্চার খাইয়ে বছর ছয়েকের বড ছেলের গায়ে এখন তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। সে ইনফ্যাণ্ট স্কুলে পড়ে।

মানসী বলে, 'ছেলেমেয়ের দিকে বেশী তাকাতে পারি না, যত্ন হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধ হয় পাঁচ দশ মিনিটের বেশী ওঁর খেয়াল থাকে না যে বাচ্চারা আছে। বিদ্বান হলে কি মানুষ স্বার্থপর হয় ?'

'শিষ্যের কাছে গুরু-নিন্দা করছেন ?'

'গুরুপত্নী হিসাবে করছি।'

নরেন একটু চুপ করে থেকে বলে, 'স্বার্থপরতা বলা যায় কি ? ওনার

নিজের জন্ম তো জ্ঞান চর্চা নয়। বিদ্যার জন্ম আদর্শের জন্ম এরকম মেতে থাকলে বোধ হয় স্বার্থপরতা হয় না।'

মানসী চোখ তুলে তাকিয়ে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে প্রশ্ন করে, 'আপনি এ যুক্তি মানেন?'

নরেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জবাব দেয়, 'না। বিদ্যা বা আদর্শ কারো নিজের স্বার্থ নয়, এই অজুহাতে স্বার্থপরতা চলে না।'

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসে।

মাধবের অগোচরে তার সম্পর্কেই একটা যেন বোঝাপড়া হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। খোলাখুলি বোঝাপড়া, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যেই যেটা সম্ভব হয়ে থাকে। পরামর্শ করে তারা যেন ঠিক করে ফেলল, যে মাধবের সম্পর্কে অন্তত একটা দিকে তাদের মত মিলে গেছে—মানুষটা সে স্বার্থপর এবং দু'জনেই তারা তার সঙ্গে মানিয়ে চলে।

নিজেকে শিষ্য বললেও মাধবের চেয়ে সমীর বয়সে পাঁচ ছ' বছরের বেশী ছোট হবে না। মাধব লেখাপড়া শিখেছিল এক মাসীর টাকায়, মাসী একরকম জোর করে ছাত্র অবস্থাতেই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। গুরুশিষ্য তারা পরস্পরকে আপনি সম্বোধন করে। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারও তাদের মোটেই গুরুশিষ্যের মত নয়, প্রায় সমবয়সী দু'জন পরিচিত মানুষের মত।

তর্ক করতে করতে মাধব চটে যায় বটে, সেটা কিন্তু মূর্খ শিষ্যের বেয়াদবিতে গুরুর চটে যাওয়া নয়। জগতের সেরা বুড়ো জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসে মাধবের মতামতের বিরুদ্ধে তর্ক জুড়লে তাদের উপরেও চটে উঠতে মাধবের বাধত না। বুদ্ধির জড়তা এবং তার যুক্তি না মানার অজ্ঞতা একেবারেই সত্য হয় না মাধবের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাধব ফিরে আসে। থলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় তরীতরকারী সে এনেছে অতি সামান্যই। তবে হাতে ঝুলিয়ে এনেছে মস্ত একটা ইলিশ মাছ।

বাজারের থলিতে এত যায়গা খালি থাকতে, থলির মধ্যে মাছটা রেখে হাতটা খালি করার বদলে, মুখে সুতো বাঁধা মাছটা হাতে ঝুলিয়ে এনেছে কেন, বুঝতে নরেনের অন্ততঃ দেরী হয় না।

ভুলো মন বলে নয়। হিসেবী মন বলেই।

সে চায় দশজনে চেয়ে দেখুক, দেখবে সে কত বড় একটা মাছ কিনে এনেছে তার বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্য।

দশজনে জানবে, মানুষটা সে নিজের সংসার সম্পর্কে নিষ্ঠুর রকম উদাসীন নয়। দশজনে বুঝবে, যতই সে পুঁথিপত্রে মুখ গুঁজে সকলকে এড়িয়ে চলুক, মানুষটা সে তাদেরই মত সংসারী। সংসারের জন্য সে বাজারেও যায়, এত বড একটা ইলিশ মাছও কিনে আনে।

কিন্তু ইলিশ মাছটা দেখে মানসী যেন ক্ষেপে যায়।

মাধবের হাত থেকে মাছ আর থলিটা নিয়ে রান্না ঘরে যাওয়ার বদলে সেইখানে সেই বিদ্যামান্দরে বইখাতায় স্তূপাকার টেবিলটার পাশে বাজারেব থলিটা উপুড করে দেয়।

মাধবের আনা বাজার দেখে নরেনেরও হাসি। মানসীর রাগটাও সে সমর্থন করে। কিন্তু একটা কথার মানে ভেবে পায় না। যতই আপন-ভোলা কাছাখোলা লোক হোক, বাজার তো বরাবর মাধব নিজেই নিয়ে আসে। এতদিন বাজার করেও তার কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না, মাছ তরকারী কেনার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য দরকার হয়!

'দুটো আলু আর একটা বেগুন? কপি পেলে না? শাকপাতা পেলে না? লাউ কুমড়ো পেলে না? তোমার সয় না, তুমি ভালবাস না, তাই বলে আমরাও কি খেতে পারব না?'

আশ্চর্য্যের বিষয়, নরেনের সামনে এরকম ধমক খেয়েও মাধব রাগ করে না। হাসিমুখে বলে, 'কি হল জানো? প্রথমে মাছটা কিনে ফেললাম। তার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা বেশী নেই। তরকারী কম কিনতে হল।'

নরেন এবার হেসে ফেলে।

তরকারী কম কিনতে হল! তরকারী কেনার নিয়ম রক্ষার জন্য দু'টো আলু আর একটা বেগুণ না কিনলেই হত! মানসীরও রাগ করার কারণ থাকত না। এত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছে—মাছের ঝোল দিয়ে দিব্যি ভাত খাওয়া চলে।

মুখে যা-ই বলুক, উনানটাকে মানসী একেবারে মিছামিছি জ্বলে যেতে দেয় নি। কোন রকম একটা ডাল যে ফুটিয়ে নিয়েছে, সম্ভারের গন্ধেই সেটা জানা গিয়েছিল। ডাল আছে, তার সঙ্গে ইলিস মাছ ভাজা, ইলিস মাছের ঝোল—এ তো রাজভোগ!

তবু তরকারী-প্রীতির অন্ধ সংস্কারের বশে দুটো আলু আর একটা বেগুণ কিনে আনার কি প্রয়োজন ছিল মাধবের!

মানসীও পাতাল থেকে আকাশে ওঠার মত হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, 'ধন্য মানুষ তুমি!'

মাধবের কৈফিয়ৎ শুনেই রাগ যেন তার জল হয়ে গেছে। এমন যে বিদ্যা-পাগল আপন ভোলা মানুষ, তার উপর কি রাগ রাখা যায়!

নরেনের মনে জাগে আপশোষ। সে-ই কি মানসীকে আজ উস্কে দিয়েছে বেশী করে মানিয়ে চলার জন্য, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য? মাধবকে নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কথার এই মানেই কি মানসী বুঝেছে যে জ্ঞানের জন্য যে পাগল হয় তার অন্য রকম পাগলামি, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা হোক, বা স্বার্থপরতা হোক, সে পাগলামিগুলিকেও মেনে নিতে হবে, প্রশ্রয় দিতে হবে?

রাগ যদি নাই রাখা যায় কি দরকার ছিল অত বেশী রেগে যাবার? মাধব একটা পাগলামি করে বসেছে এই কৈফিয়ৎ শুনেই রাগ জল করে দিয়ে এভাবে হেসে উঠবার? এতে মাধব তো আরও বেশী পাগলামি করতে সাহস পাবে! এভাবে নিজের জীবনটা নিজের কাছে অসহ্য করে তুললে শেষ পর্যন্ত কি উপায় হবে মানসীর?

মানসী যায় মাছ কুটতে, তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে এসে মাধব বলে, 'আসুন আমরা বসি।'

২

দর্শনের আরেকটা মোটা বই নিয়ে মাধবের বাড়ী থেকে বেরোবার সময়েও নরেন জানত সে বাড়ী ফিরে যাবে।

পথে নেমে মনে পড়ে যায় নন্দনকে।

নরেন নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

এত ঢিলে হয়ে গেছে তার মন? দরকারের চেয়েও মস্ত বড একটা ইলিশ মাছ কিনতে পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় চার পয়সার তরকারী কিনে বাজার সারা মাধবের পোষায়, মাধবকে মানায়। শুধু ছোঁয়াচ লেগে মাধবের মত মহাপুরুষ হয়ে উঠলে তার চলবে কেন?

কাল সে জানতে পেরেছিল যে তাদের আপিসে একটা নতুন পোষ্টে একজন নতুন লোক নেওয়া হবে।

একেবারে যেন নন্দনেরই বয়স আর বিশেষ গুণাগুণ ইত্যাদি হিসেব করে সৃষ্টি করা নতুন চাকরী।

ভেবেছিল আপিস থেকে বাড়ী ফেরার পথেই নন্দনকে খবরটা দিয়ে যাবে— কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন লিখবে আর পেশ করবে, তাও জানিয়ে দেবে। সোমবার দশটায় নিজে নন্দন, দরখাস্তটা দাখিল করে আসবে।

কিন্তু মোটা বইটার বক্তব্যে তার ছিল অনেকগুলি খটকা। সব চেয়ে জরুরী খটকাটা মনটা জুড়ে ছিল সারা দিন।

আপিস থেকে বেরিয়ে সে ওই কথাই ভেবেছে। রাত জেগে ওই বইটাই পড়েছে। সকালে তর্ক আর আলোচনার ভিতর দিয়ে মাধবের কাছে খটকাগুলির মীমাংসা করে নেওয়ার কথাই ভেবেছে।

বই-এর নেশায় মেতে একেবারে ভুলে গেছে নন্দনকে।

ভুলে গেছে বন্ধুর চাকরীর প্রয়োজন কত বেশী মারাত্মক বাস্তব সমস্যা। একটা চাকরীর খবর জানলে বন্ধুকে খবরটা জানানো তার কত বড় গুরুতর কর্তব্য!

নন্দনের অদ্ভুত আশ্চর্য্য সহনশীলতার জন্যই কি এ রকম হয়? এতকাল চাকরী জোটাতে না পেরেও ব্যাকুল হয় না, পাগল হয় না, ঘরে বাইরে সমস্ত অপমান মুখ বুজে সয়ে যায়, নিদারুণ অসুবিধাগুলি নিয়ে কখনো কারো কাছে নালিশ জানায় না,—এই জন্যই কি তারও খেয়াল থাকে না, যে যেমন তেমন একটা চাকরী জোটানো কি গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর কাছে?

মৃত বাপের জেঠার সংসারে আশ্রিত নিরুপায়ের মত অবজ্ঞা অবহেলা মেনে নিয়ে জীবন যাপন করে—কিন্তু নন্দনের যেন দুঃখ নেই, অপমান নেই, আপশোষ নেই। অন্যায় অবিচার এমনভাবে সহ্য করে চলে, যেন গ্রাহ্যই করছে না।

বাপের এক ছেলে।

তার বাবা রমেশ মরবার সময় তার জেঠা হেমেন্দ্রর কাছে সমর্পণ করে গিয়েছিল হাজার পাঁচেক নগদ টাকা, হাজার পনের টাকার জীবন বীমা, নন্দনের মার হাজার তিনেক টাকার গয়নাগাঁটি—আর পাঁচ বছরের নন্দনকে।

বাসনপত্র আসবাবপত্র ইত্যাদি আর সমর্পণ করে যেতে হয় নি, হেমেন্দ্র এমনিতেই দখল পেয়েছিল।

মরার সময় শুধু তাকেই যে বাবা, হেমেন্দ্রের হাতে সঁপে দিয়ে যায় নি, নগদ টাকা জীবনবীমা গয়নাগাঁটিও দিয়ে গিয়েছিল, বড় হয়ে এটা জানতেও কোন অসুবিধাই ঘটে নি নন্দনের।

আত্মীয়স্বজন কতবার যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর তাকে জানিয়েছে, সমবেদনা দেখানোর সঙ্গে কত যে পরামর্শ দিয়েছে প্রতিকারের এবং প্রতিশোধের!

নন্দন চুপচাপ শুনে গেছে।

একমাত্র লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সবরকম দুর্ব্যবহার চুপচাপ সয়েও গিয়েছে।

ছেলেটা সত্যি চালাক।

বিনা মাইনের ছোকরা চাকরের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়েও সব সহ্য করে যায়, শুধু লেখাপড়ার ব্যাপারে করে প্রতিবাদ!

লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্য তার এই লড়ায়ের ইতিহাসটা নন্দন নিজেই নরেনকে সবিস্তারে জানিয়েছে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিয়েছে কেন মাথা নীচু করে সব সহ্য করে যেত, কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে উঠত ফুঁসে।

বলত, 'কেন? বাবা মরার সময় বলে গেছেন, আমাকে লেখাপড়ার সব খরচ আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে নেই ভাবছেন? পড়তে না দিলে আমি হাঙ্গামা করব কিন্তু বলে দিলাম।'

মরবার আগে পাঁচ বছরের ছেলেকে বাপ কি বলে গিয়েছিল ছেলে সেটা মনে করে রেখেছে! হেমেন্দ্র জানে এটা অসম্ভব, কিন্তু পাপীর মন ছায়াতে ভয় পায়, ইঙ্গিতে ভড়কে যায়।

হেমেন্দ্র বোধ হয় ভাবত, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই ছেলেটাকে, লেখাপড়ার খরচ ছাড়া আর কিছুই চায় না, ছেঁড়া জামাকাপড় মেনে নেয়, যা পায় তাই খেয়ে খুসী থাকে, মুখ বুজে ঠিক চাকরের মত সংসারের কাজে খাটে—শুধু লেখাপড়া শিখতে চায়, শিখুক।

ছেলেটার মাথাও আছে।

ভাল রকম পাশ করলে একদিন হয় তো ভাল চাকরী পাবে। সেদিন হয় তো লেখাপড়া শিখবার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাকে খাতির করবে, মাসকাবারে মাইনের টাকা হাতে তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

অন্ততঃ প্রথম কয়েকটা বছর তো করবেই।

হেমেন্দ্র কাটা কাপড় ছিটজামার একটা ছোটখাট দোকান চালায়। লোকে বলে, নন্দনের জন্য রেখে যাওয়া তার বাপের টাকা দিয়েই নাকি সে দোকানটা করেছিল।

তিনটি ছেলে মারা গেছে হেমেন্দ্রের। বড় ছেলেই কেবল বেঁচেছিল কিছু

দীর্ঘকাল, তারই বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বুড়ো হেমেন্দ্রের সংসার। তেইশ বছরের গোবিন্দ ছাড়া ছোট ছোট তিনটি ছেলে আছে, ছবিরাণীকে নিয়ে দুটি মেয়ে।

নন্দন ভালভাবেই পাশ করেছে।

বিজ্ঞানে মাষ্টার উপাধি পেয়েছে।

ভাল মন্দ একটা চাকরী কিন্তু নিজেও জোটাতে পারে নি অন্য কেউ জুটিয়েও দিতে পারে নি আজ পর্য্যন্ত!

পাশ করা‹ পর তিন বছর ঘুরে গেছে কবে!

নন্দন বাজারের থলি হাতে বাড়ীর ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, বন্ধুকে দেখেই সে বলে, 'এই যে চাকুরে মহাপুরুষ, আসুন! আসুন!'

রীতিমত নালিশের সুর, বেশ ঝাঁঝ আছে কথায়।

নবেনের মনে হয়, বাড়ীর মানুষের কদর্য্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বন্ধুর কাছে পর্য্যন্ত কখনো নালিশ জানাত না বলেই নন্দন তার সামান্য ত্রুটি পেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশ জানাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারই কাছে!

প্রাণটা তো তার জ্বালা করে। জ্বালাটা প্রকাশ করার সুযোগ তো খোঁজে তাব প্রাণ!

কদাচিৎ হয় তো দু'একটা দিন ফসকে যেত, নন্দনের সঙ্গে ছিল তার নিত্যকার মেলামেশা। চাকরী পাওয়ার পর সেটা কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসেছে যে বাজাবে একদিন নন্দনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রায় একমাস পরে আজ আবার দেখা!

কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

কী কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন মরণের পরীক্ষায় পাশের নম্বর পাওয়া, তা কি নন্দন জানে না?

দূরে যদি সে ভেসে গিয়েই থাকে স্রোতে, নন্দনও কি অবুঝ আত্মীয় স্বজনের মত তাকে খোঁচা দেবে যে তার বন্ধুত্ব খাঁটি নয়?

নরেন ক্ষুব্ধ হয়। তাই উদাসভাবে বলে, 'ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসি নি!'

'এত ব্যস্ত ছিলি, বিষম কর্মী মানুষ হয়ে গিয়েছিলি, এর মধ্যে ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেল? কর্ম ফুরিয়ে গেল?'

নন্দনের ঝালঝাড়ার চেষ্টা এবার খুসী করে নরেনকে। নন্দন তবে অভিমান করায়, রাগ করার এবং সেটা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করার স্তরে নেমে এসে সাধারণ মানুষ হয়েছে, অংশীদার হয়েছে তাদের রাগারাগি ঠোকাঠুকি ভরা সাধারণ জীবনের? কোন বিষয়ে কারো কাছে ভুলেও কখনো নালিশ না জানানোর অসাধারণত্ব বর্জন করেছে?

'অ্যাদ্দিন গাধার মত খাটছিলাম তাই। তোর কাছে না এসে রোজ সিনেমা দেখেছিলাম ভেবেছিস নাকি? চাকরী করি আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বই পড়ি। কপাল মন্দ না হলে কারও এ রকম চাকরী জোটে!'

'তার মানে? চাকরী পেয়ে চাকরীর কাঙাল আমার কাছে কপালের নিন্দা?'

'মানে তুই বুঝবি না—আগে চাকরী হোক।'

'এমন হঠাৎ আসার মানে তো আছে?'

'বিশেষ দরকারে এসেছি।'

'বিশেষ দরকার? আমার সঙ্গে? আয় ভেতরে এসে বোস্। চা কিন্তু পাবি না। আমার নিজের চা বন্ধ।'

ঘরে গিয়ে তারা বসতেই ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় হাঁক আসে—'নন্দন, তুমি আড্ডা জমালে আমি কি করে নেমন্তন্ন রাঁধব? বাজারটা এনে দাও? কোন ভোরে উনানে আঁচ দিয়েছি—

আরও কোমল মেয়েলি গলায় জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়, 'একজন বাড়ী এসেছে, পাঁচ দশ মিনিট বলুক না কথা? তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর মা।'

ছবিরাণীর গলা! জোর গলায় মার হুকুমের প্রতিবাদ করে সে তাকেও জানাচ্ছে যে ভাখো, তোমার মান রাখতে আমি কেমন মার সঙ্গেও লড়াই করি!

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে নরেন বলে, 'চা বন্ধ, না? অ্যাদ্দিনে তা হলে মুখ তুলে দুটো কড়া কথা বাড়ীর লোককে বলতে পেরেছিস্!'

নন্দন এবার একটু হাসে।

'বুঝেছি। আজ হঠাৎ আমার মুখে নালিশ কেন জিগ্যেস্ করছিস তো? অন্যায় মানি আর না মানি, আমি নালিশ জানি না। ভাবছিস্ তো আজ নালিশ দিয়ে সুরু করেছি কেন? ঠিক ধরেছিস্, তোর মত বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা!'

'আমি ভাগ্য টাগ্য মানি না।'

'বটে! চাকরী পেয়েছিস্ বলে এক্ষুনি তো মন্দ কপালের নিন্দে করছিলি, পাঁচ মিনিট আগে।'

'ওটা অভ্যাস—কথার কথা বলেছি। মনের দুঃখ প্রকাশ করেছি।'

'অভ্যাসটাই আসল। ভাসা ভাসা ভাবে তুই কি বড় বড় কথা ভাবিস্ আর ছাড়া ছাড়া ভাবে ভাগ্য না-মানার দু'একটা কি প্রমাণ দেখাস্—তাতে কি আসে যায়? ফ্যাসাদে পড়লে ওসব খেয়াল থাকে না—ভাগ্য-মানার অভ্যাসটাই বড় হয়ে ওঠে।'

নরেন বাধা দিয়ে বলে, 'আমার বিষয়ে লেকচার না ঝেড়ে নিজের কথা কি বলছিলি বলে শেষ কর না?'

নন্দন বলে, 'বলছি বলছি—তোর কথাটা আগে না বললে আমার কথাটা কিন্তু জমবে না।'

নরেন বলে, 'আমি একটা চাকরীর খবর এনেছি। আমাদের আপিসে একটা নতুন চাকরী সৃষ্টি করা হয়েছে। সোমবার দশটা বাজার আগে দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে গিয়ে হাজির হবি। কি ভাবে কি লিখতে হবে স্লিপে লিখে এনেছি।'

নন্দন প্রায় নির্ব্বিকারের মত শোনে।

নরেন বলে, 'শুধু তাতে হবে না। চাকরী হওয়ার ব্যাপার জানিস্ তো এদেশে? আজকেই মাধববাবুর একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করবি—বড় বড়

ডিগ্রি আছে, তোর পেটে বিদ্যা আছে উনি এটা লিখে দিলে কাজ দেবে। তারপর যাবি তোর বাবার সেই যে উপরওলা ছিল বনমালী বাবু!—তার কাছে। বাবার কথা বলবি, জোর করে চেপে ধরবি যে চাকরীটা করে দিতেই হবে। ওর সঙ্গে আমাদের আপিসের হারাণ বাবুর খাতির আছে।'

নন্দন চুপ করেই থাকে।

'দরখাস্ত দিবি হারাণ ব্যাটার দপ্তরে, কিন্তু রেজেষ্ট্রী করে দু'লাইন একটা চিঠি পাঠিয়ে দিবি বড় সায়েবের কাছে। শুধু লিখবি যে চাকরীটার জন্য যথারীতি একটি দরখাস্ত যথাস্থানে পেশ করেছিস। নইলে হারাণ ব্যাটা দরখাস্ত চেপে দেবে।'

এবার নন্দন একটু হাসে।

'কিছু হবে না।'

'চেষ্টা তো করতে হবে?'

'তা করতে হবে, তবে কিছু হবে না। বরং আমার কাছে খবর জেনে বনমালী চাকরীটা নিজের কাউকে বাগিয়ে দেবে।'

এসব সকলের জানা কথা, তর্ক করার কিছু নেই। নরেন তাগিদ দিয়ে বলে, 'তবু চেষ্টা করতেই হবে। এবার তোর কথাটা চটপট বলে বাজারে যা। এবা আবার চটাচটি করবে।'

'কেন? চাকর নাকি আমি?'

'ও বাবা! তুই দেখছি ফোঁস করে উঠছিস্।'

নন্দন সহজভাবেই বলে, 'চুপ করে থাকার সময় চুপ করে থাকতে হয়, আবার ফোঁস করার সময় হলে ফোঁস করতে হয়। দাদুর কাছে কাল পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলাম। একটা চায়ের দোকান দেব। দাদু পরিস্কার বললে, লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি, টাকা রোজগার করে আনবি যা।'

'তাতো বলবেই। সে তো জানা কথাই। পাঁচটা টাকা চাইলে দেবে না জানিস্, পঞ্চাশ টাকা তুই চাইতে গেলি কোন বিবেচনায়?'

নন্দন একটু হাসে।

'বিবেচনা ঠিকই করেছিলাম। টাকা কটা ভিক্ষা চাই নি—দাবী করেছিলাম। কাল পর্য্যন্ত দাদুকে কোনদিন টের পেতে দিইনি, বাবা আমার জন্য কি রেখে গেছেন, কত রেখে গেছেন আমি সব জানি। কাল প্রথম বললাম, দাবী করলাম বাবার টাকা থেকে আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই। কি বললে জানিস্? আমি নাকি নেমকহারাম, বজ্জাত। বাবা যা রেখে গিয়েছিল আমার পিছনে করে সব খরচ হয়ে গেছে—সাত আট বছর আগে। এতদিন দাদুর টাকায় আমি খেয়েছি পরেছি লেখাপড়া শিখেছি।'

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

'তুই মেনে নিলি? ঝগড়া করলি না?'

নন্দন বলে, 'ঝগড়া করলাম বৈ-কি। কিন্তু মনে জোর পেলাম না, জোর গলায় কথা বলতে পারলাম না। আমার পলিসিটাই আগাগোড়া ভুল ছিল। আগে ঝগড়া করলে, দশজন আত্মীয়স্বজনকে ডেকে মধ্যস্থ মানলে হয়তো কিছু ফল হত। লেখাপড়া শেখার খাতিরে অ্যাদ্দিন চুপচাপ মেনে এসেছি যে, বাবা কিছু রেখে গেলেও দাদুই দয়া করে আমায় খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। পরীক্ষা পাশ করাটাই মোক্ষম ধরেছিলাম—সেটাই হয়েছিল আসল ভুল।'

একটু সে হাসে, 'দাদুর এক যুক্তিতে ভুলের মাশুল তাই উসুল হয়ে গেল। কথাটি কইতে পারলাম না।'

'কি রকম?'

'দাদু বললে, ছ'সাত বছর বয়সের সময় আমার নাকি সাংঘাতিক অসুখ হয়েছিল। বাঁচা সম্ভব ছিল না। হাজার হাজার টাকা ঢেলে চিকিৎসা করে দাদু আমায় বাঁচিয়েছিল। আমি কি বুঝব ভাইএর ছেলে একটা দায় ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে মরে গেলে সেকেলে মানুষের কি অবস্থা হয়—আমরা তো একেলে নরাধম ছেলে। নিজের নাতিনাতনীর মরণ বাঁচন তুচ্ছ করে দাদু আমায়

বাঁচাবার দায় পালন করেছে। বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাতে অবশ্য সাহায্য হয়েছে খানিকটা। তবু ক'জন করে এরকম?'

নন্দন একটু থেমে বলে, 'ভাব দেখলে তোর ধাঁধাঁ লেগে যেত। এমন করে আকাশের দিকে চেয়ে কথাগুলি বলছিল, যেন বাবাকে আকাশে দেখতে পাচ্ছে আর নালিশ জানাচ্ছে—'তোমার দেওয়া দায় প্রাণ দিয়ে পালন করলাম, তোমার অকৃতজ্ঞ ছেলেটা কি বলছে শোন!' কি নিয়ে ঝগড়া করব? কোন্ যুক্তিতে বলব ছেলেবেলা আমার ওরকম অসুখ হয় নি, তুমি সব বানিয়ে বলছ?'

নরেন আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কি বললি কথাটা? তুই নয় ছোট ছিলি, মনে নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ করে তোর কঠিন রোগের চিকিৎসা হল—আত্মীয়-স্বজন কেউ কিছু জানল না? তারা তো বলতে পারবে সত্যি তোর অসুখ হয়েছিল কিনা, চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল কিনা?'

নন্দন অদ্ভুত একটা মুখের ভাব করে চুপ করে থাকে।

নরেন রেগে বলে, তুই 'সত্যি বোকা। বলতে পারলি না ক অসুখ হয়েছিল, কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিল—'

'চুপ কর দাদা। ও সব বলতে হয় নি। বলবার আগেই দাদু সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে—আজে বাজে তর্ক করিস্ না, বাপের গচ্ছিত কোটি টাকা পাওনা হয়ে থাকে, আদালতে গিয়ে আদায় কর। তার আগে সোজাসুজি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।'

'তবু তুই বেরিয়ে যাস্ নি?'

'কেন যাব? বোকামি করে বিপাকে পড়েছি। তাই বলে আরও বোকামি করে আরও বেশী বিপাকে পড়ব? অ্যাদ্দিন বোকার মত সব সয়ে এসেছি, এখন বুঝেছি বলেই বোকার মত তড়বড় করে সব নষ্ট করব? অ্যাদ্দিন যখন সয়েছে, আর ছ'মাস এক বছরও সইবে। প্রতিকার করব, শোধ নেব।'

'দেয়ালে মাথা ঠুকে ?'

'ভাঙা দেয়াল, এমনিতেই ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার মায়া না করে ঠিকমত ঠুকতে পারলেই ধ্বসে পড়বে !'

নরেন খানিকক্ষণ চুপচাপ ভাবে ! তার নিকটতম বন্ধু, কিন্তু এতদিন তার চরিত্রের বড় একটা দিকই তার জানা ছিল না। ওকে সে ভাবত ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। নিরীহ গোবেচারী বন্ধুটির জন্য বেশ খানিকটা অবজ্ঞার ভাবও বরাবর মনের মধ্যে পোষণ করে এসেছে।

আজ মনে হয়, সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, অন্যায় সহ্য করাটাও তো তেজের পরিচয় হতে পারে ! গোয়ার্তুমি করার জোরালো ঝোঁকটা সামলে অন্যায়কে একদিন ভেঙে চুরমার করার প্রয়োজনেই অন্যায়কে মেনে চলার মধ্যেও তো কম মনের জোর, কম তেজের পরিচয় থাকে না !

এটাও তো লড়াই করারই কায়দা। এগোবার জন্যই যখন পিছিয়ে যাওয়া দরকার তখন পিছিয়ে যাওয়া ?

নন্দন হিসাবে ভুল করে থাকতে পারে, পরীক্ষা পাশ করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ধরে নেওয়ায় ঠকে গিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার যুদ্ধটা তো সে চালিয়ে গেছে ঠিকমতই !

নন্দন বলে, 'কি ভাবছিস্ ? এবার ওঠ্, বাজারটা করে আনি।'

নরেন শুনতে পায় না, একভাবে বসে থাকে। তার কানে ক্রমাগত ভেসে আসে অন্দরের রাগ বিরক্তি বাদ প্রতিবাদের গুঞ্জন—ধমক-ধামকের মেয়েলি ও পুরুষালি গর্জন ! আর ছেলেমেয়ের এলোমেলো কান্না !

তার নাকে লাগে অন্দরেরই ডাল সম্ভারের ঝাঁঝালো গন্ধ—আধপচা মাছ ভাজার গন্ধ।

ছবিরাণীর গলার আওয়াজ কিন্তু মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না !

সে তাকে মনে মনে স্মরণ করেছে জেনেই যেন ছবিরাণী এবার নিজেই

বৈঠকখানায় আসে। দু'কাপ চা হাতে নিয়ে। বলে, 'বাজার আনতে আর দেরী করলে তো চলে না বড়দা। চা'টা খেয়ে চলে যাও।'

'চা খাব না।'

বলে নন্দন গট গট করে বেরিয়ে যায়।

উদারতা দেখিয়ে মার তাগিদ ঠেকিয়ে সে তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল, ঠিক কথা ফুরিয়ে আসতেই নিজে এসে তাগিদ দিয়েছে বাজারের জন্য।

সে কি করে টের পেল তাদের কথা ফুরিয়েছে ?

কথা বলার সুযোগ দিয়ে আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল ?

তারা বৈঠকখানায় বসে কথা সুরু করেছে টের পেয়েই গৌরী গলা চড়িয়ে হাঁক দিয়ে নন্দনকে ডেকেছিল—তাড়াতাড়ি বাজার এনে দেবার জন্য।

তখন শুধু শোনা গিয়েছিল ছবিরাণীর গলা। মার হাঁক ডাক দিয়ে হুকুম করাটা রদ করার জন্য গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করা।

তারপর থেকে ছবিরাণীর গলার একটি আওয়াজও সংলগ্ন বৈঠকখানায় পৌছায় নি।

বৈঠকখানাই বটে।

ঠাট পর্য্যন্ত বজায় রাখা যায় নি। ড্রেসিং টেবিলটা অন্দরে সরে গেছে, ছ'টার মধ্যে চারটে চেয়ার বিক্রী হয়ে গেছে, জাপানী মাদুর বিছানো মেঝে হয়েছে অনাবৃত।

রাত্রে দু'টো মশারির দুটো বিছানা হয়—পাঁচজন ঘুমায়। সকালে এক ঘণ্টার জন্য হয় সাতজন ছাত্রছাত্রীকে সনৎ মাস্টারের একঘণ্টা প্রাইভেট পড়ানোর যাত্রা পালা।

তারপর বৈঠকখানা খালি রাখা হয় দোতলায় শয্যাশায়ী রমেন ডাক্তারের জন্য। ছবিরাণীর সে মেজ মামা। ভাল চাকরী করত—রোগে ভুগে ভুগে প্রায় পঙ্গু হয়ে চাকরী হারিয়ে হেমেন্দ্রের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে।

সে ডাক্তার নয়, তবু ডাক্তারি করে।

যদি কোন আরোগ্য-প্রার্থী আসে, পয়সা দিয়ে ওষুধ ও আরোগ্য চায়—রমেন দামী শালটা গয়ে জড়িয়ে অতিকষ্টে রোগীর ইচ্ছানুসারে হোমিপ্যাথিক ওষুধেব ব্যবস্থা দিয়ে ওষুধের দাম আব এক টাকা ফি নিয়ে আবার দোতলায় নিজেব বিছানায় শুতে যায়।

'এত বেলায় চা খাব না।'

ছবিরাণী অবাক হবার ভাণ কবে বলে, 'ও বাবা, চাকবী পেয়ে খালি পায়াই ভাবি হয নি, এ রোগও জন্মেছে! বেলা দশটায় তৈবী চা সামনে ধবে দিলেও বাবু মশায় খেতে চান না!'

নন্দনের চা জলখাবাব বন্ধ হয়েছে। নন্দনকে না দিয়ে একা তাকে দেওয়া য ়্য না বলেই ছবিবাণী দু'কাপ চা এনেছে। তাব এই দয়া মেনে না নিয়ে নন্দন চা না খেয়েই চলে গেছে বাজাবে।

চা খেতে তাই বিতৃষ্ণা বোধ হচ্ছিল নরেনেব। কে জানে, নন্দনেব মত পাশ কবা বেকার হয়ে দিন কাটালে এ বাড়ীতে তাবও চা জুটত কিনা!

কলেজে পড়াব সময় জুটত।—চাকবী তখন ভবিষ্যতের ব্যাপাব।

পাশ কবাব পবেও কিছুদিন জুটত।—তখন চাকরীব চেষ্টা চলছে।

এত লোকেব চাকবী হয়, তারও হয়তো হবে!

তাবপবে ক্রমে ক্রমে সকলেব মনে আশঙ্কা জাগত যে চাকবী কি এব হবে! এত লোকেব চাকবী-বাকবী নেই, এও কি তবে সেই ভাগ্যহীন নিরুপায় বেকাব দলেব একজন?

চা দিয়ে আপ্যায়িত করাব আগ্রহ কমতে কমতে একদিন ঠিক নন্দনের মতই তারও কপালে ঘটত চা-বন্ধের পরিণাম!

তবে ছবিরাণীর হাসিটা অগ্রাহ্য করা যায় না। নন্দনের সঙ্গে তার ব্যবহারও তেমন খাবাপ নয়।

নন্দন তার বন্ধু বলেই ছবিরাণী নিজেকে সামলে চলে কিনা অথবা বেকার দাদাটির জন্য তার বুকে একটু মমতা থাকায় অপমান করতে পারে না, এটা অবশ্য জানা নেই নরেনের। এত ভেজাল সংসারের মায়া মমতায়, আপাত দৃষ্টিতে যে দরদকে মনে হয় আপনা থেকে উৎসারিত, তার মধ্যেও এত ফাঁকি যে অকারণে কেউ কাউকে স্নেহ করবে, এটা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না নরেনের।

চা খেতে খেতে নরেন বলে, 'নন্দনকে একটা চাকরীর খবর দিয়ে গেলাম। হয় তো লেগে যেতে পারে।'

'বড়দার কিছু হবে না।'

'কেন হবে না?'

'এত যার তেজ, এত যার রাগ, তার কখনো কিছু হয়? কারো সঙ্গে মানিয়ে চলবে না, চব্বিশ ঘণ্টা গুম্ খেয়ে আছে। কে ওকে চাকরী দেবে? চাকরী কি গাছে ফলে!'

শুনে নরেন অবাক হয়ে যায়। এত তেজ! এত রাগ!

নন্দনের?

বাড়ীতে বিনা মাইনের চাকরের মত ব্যবহার যে মুখ বুজে বরাবর সয়ে এসেছে, তাকে খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যথেষ্টরও বেশী টাকা তার বাবা রেখে গিয়েছিল জেনেও?

এত হিসেবী নন্দন, পরীক্ষা পাশের জন্য হিসেব করে সে বাড়ীর সকলের সঙ্গে বরাবর এমনভাবে মানিয়ে চলে এসেছে—ছবিরাণী তারই নামে নালিশ করছে যে সে দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না।

তাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে ছবিরাণী হেসে বলে, 'বন্ধুর নিন্দে প্রাণে বিঁধছে, না? তোমার বন্ধুই শুধু নয়, আমার ভাইও তো বটে! সেটা ভুলে যেও না। সত্যি বড় বেয়াড়া মানুষটা। বাড়ীতে থাকে কেমন করে জানো? যেন থেকেও নেই, সবাই তার পর। সংসারের কোন ব্যাপারে থাকবে না, কোন বিষয়ে কথাটি কইবে না, হয় পড়বে নয় চুপচাপ গোমড়া মুখ করে থাকবে।'

নরেন মরিয়া হয়ে বলে, 'তোমরা অনাদর অবহেলা কর বলেই বোধ হয় ওরকম করে।'

ছবিরাণী তার হাসিভরা মুখের গালে হাত দেয়।

'কী যুক্তিই দিলে! বাপমরা ছেলে, বাপের জ্যেঠার ঘাড়ে খাচ্ছে পরছে, অনাদর অবহেলা জুটবে না তার? সংসারের নিয়ম তো তাই! ওসব সহ্য করেই হাসি মুখে থাকতে হয়। তাতে গুরুজন আর অন্য মানুষেরা খুসী হয়। ভাবে যে না, নিজের ছেলের সঙ্গে যে তফাৎটা করা হচ্ছে সে জন্য ওর রাগ বা দুঃখ নেই। ও আমাদের পর ভাবে না। সব সময় গোমড়া মুখ করে থাকলে আরও চটে যাবে না গুরুজন? আরও খারাপ ব্যবহার করবে না?'

'তুমি সত্যি ভারি চালাক মেয়ে ছবি!'

'চালাক না হলে কি উপায় আছে নরেনদা? যা দিনকাল, কত কিছু সইতে হবে তো! পড়ছিলাম, একবার ফেল করলাম—বাস্, পড়াশোনা বন্ধ। গান শিখছিলাম, গান শেখানোর খরচ বাড়ল,—বাস্, গান শেখানো বন্ধ। কুড়ি বছর বয়স হল। বাপের ভাত খাচ্ছি, বাপের কাপড় পরছি। কত সইতে হয়, তুমি কি জানবে বলো? পাশ করে দিব্যি চাকরী বাগিয়ে গ্যাঁট হয়ে আছো। কিন্তু সইতে হয় বলে কাঁদব নাকি? সারাদিন মুখ ভার করে থাকব?'

'তাতো আমি বলি নি!'

'সোজাসুজি না বললেও রকমে সকমে বলেছ। সব সময় হাসিখুসী থাকতে চেষ্টা করি কিনা, তোমরা ভাবো কত সুখেই না আছে ছবিরাণী!'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ছবিরাণী বসে।

'সুধাময় সরকারকে জানো?'

'তাকে কে না জানে? আলাপ পরিচয় অবশ্য নেই। থাকার কথাও নয়। শুধু নাম শুনেছি।'

ছবিরাণী হাসে।

'এত বিনয় করতে নেই। কে বলতে পারে তুমিও একদিন ওর চেয়ে মস্ত বড় লোক হবে না? ব্যাপারটা বলি শোন। দাদু একটা চাকরীর খবর এনে সব ঠিকঠাক করে বড়দাকে সুধাময় বাবুর কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন, গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, জিজ্ঞাসা না করলে কোন কথা বলবে না। যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দেবে। তারপর এক সময় চাকরীর কথাটা তুলে বলবে যে স্যার, আমার চাকরীটা করে দিন, আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই শুনব। দুশো টাকার চাকরী। একবার ভেবে ছাখো ব্যাপারটা? এই বাজারে দুশো টাকার চাকরী! দাদুর কথা শুনলে নিশ্চয় হয়ে যেত।'

এ ইতিহাস নরেনের অজানা নয়। ছবিরাণীর মন বুঝবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি চাকরী?'

'খুব ভাল চাকরী। এত লোকের এত বড় আপিস চালাতে হয় সুধাময় বাবুকে, তার তো জানা দরকার কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে। একলা কি খবর রাখা যায় প্রায় দুশো লোকের মধ্যে কে ঠিকমত কাজ করছে, কে ফাঁকি দিচ্ছে? বড়দাকে তাই দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতেন কে কি করছে না করছে, কাজ ঠিক মত চলছে কিনা এসব খবর পাওয়ার জন্য। এমন চাকরীটা বড়দা নিজের দোষে ভেস্তে দিল।'

নরেন ধীরে ধীরে বলে, 'ওটা কি ভদ্রলোকের কাজ? ও তো স্পাইগিরি করা? একটু মনুষ্যত্ব থাকলে টাকার খাতিরে এ চাকরী নেওয়া যায় না।'

ছবিরাণী ব্যাঙের হাসি হেসে বলে, 'স্পাইগিরি! স্পাইগিরি আবার কি? কাজ করার জন্য সবাই মাইনে পাচ্ছে, কাজে কে ফাঁকি দিচ্ছে সেটা শুধু ধরিয়ে দেওয়া। ট্রামে যে ইন্‌সপেক্টর এসে টিকিট বিক্রীর কাগজ ছাখে, সকলের টিকিট ছাখে—সে কি স্পাই নাকি? সবাই ঠিকমত কাজ করছে কিনা এইটুকু দেখার জন্য তাকে রেখেছে, সেও সেই কাজটুকু করছে।'

নরেন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

'তুমি ভুল বুঝেছ। ট্রামে বাসে রেলগাড়ীতে ইন্সপেক্টরের কাজ আর

এ কাজটায় অনেক তফাৎ। কাজ ঠিকমত চলছে কি না, কাজে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না দেখার লোক সুধাময়ের আপিসে নেই ভেবেছ? একজন নয়—কয়েকজন আছে, খোলাখুলি ভাবেই আছে। ম্যানেজার, বড়বাবু, অমুকবাবু তমুকবাবু এদের কাজই হল কেরাণীদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটানো। নন্দনকে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতে চেয়েছিল কে কি বলছে, কে কি করছে, তলে তলে খবর নিয়ে চুপি চুপি জানাবার জন্য। আপিসের কাজের খবর নয়, কেরাণীদের প্রাইভেট খবর! বন্ধুর মত সকলের সঙ্গে মিশবে আর সকলের হাঁড়ির খবর চুপি চুপি বড় কর্তাদের কানে পৌঁছে দেবে।'

মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছবিরাণী ধোঁকায় পড়ে গেছে। চাকরীটা ফস্কিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য আজ কতকাল সে নন্দনের উপর ভীষণ চটে আছে, আজ হঠাৎ মত বদলানো বড়ই কঠিন মনে হয়।

'সত্যি? তুমি কি করে জানলে?

'আমি জানি। আমাদের আপিসেও এ রকম লোক আছে একজন। বেশীদিন তো গোপন রাখা যায় না, ধরা পড়ে যায়। সে ব্যাটা কাছাকাছি এলেই আমরা সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলি।'

'তবে তো বড়দার দোষ নেই।'

'নিশ্চয় দোষ নেই। বরং ওকে তারিফ করতে হয়। এ অবস্থায় হাতে পেয়েও দুশো টাকার চাকরী না কি নেওয়া চাট্টিখানি কথা?'

ছবিরাণী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

'তোমার মাইনে টাইনে বাড়বে না?'

'বাড়ছে! কমে কিনা দ্যাখো।'

ছবিরাণী এ কথাতেও হাসে। তবে হাসিটা তার তেমন তাজা মনে হয় না। হাসিখুসি থাকার নিয়মটা পালন করবার জন্যই সে যেন গায়ের জোরে হাসে।

সকালে নন্দন একবার বাজার করে এনেছিল। এতবেলায় আবার তার বাজার

করতে যেতে হওয়ার কারণ গোবিন্দ। দোকান থেকে দীননাথকে দিয়ে সে খবর পাঠিয়েছে যে, দুপুরে তার খাতিরের দু'জন লোক বাড়ীতে খাবে—বিশেষ-ভাবে যেন রান্নাবান্না করা হয়। মাংস না হলেও চলবে—কিন্তু কমপক্ষে দু'রকম মাছ যেন হয়।

কাটা কাপড় ছিট জামার দোকান এখন গোবিন্দই চালায়। জোরালো উৎসাহ নিয়ে সে ব্যবসা বাড়াবার জন্য কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে।

অল্পদিনে খানিকটা বাড়িয়েও দিয়েছে দোকানের বেচাকেনা।

বুড়ো হেমেন্দ্র অল্পবয়স' নাতির হাতে দোকান ছেড়ে দিতে গোড়ায় সাহস পায় নি।

বেশ চলছিল দোকানটা, আগের মত না হলেও মোটামুটি চলে যাচ্ছিল।

গোবিন্দের মাথায় ঝোঁক চাপল দোকানটা বাড়িয়ে ফাপিয়ে তুলতে হবে, বড় ব্যবসাদারের হুকুমে দোকান চালিয়ে ভাড়া করা মজুরের মত শুধু দোকান চালানোর মজুরি নিয়ে সে আর দোকান চালাবে না।

দোকানকে সে স্বাধীন করবে। স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবে।

সে কি কেরাণী ?

আপিসের কলম পেষা মজুর ?

তাদের নিজের দোকান।

তারা খুসীমত চালাবে।

সত্তর বছরের বুড়ো হেমেন্দ্র বলেছিল, 'পারবি কি ? সামলেসুমলে মিলিয়ে মিশিয়ে ? বড় দায়, বড় ঝনঝাট। সব সয়ে গিয়ে হিসেবপত্র বুঝে পারবি কি চালাতে ?'

'কেন পারব না ?'

হেমেন্দ্র বোধ হয় খুসী হয়েছিল, মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল।

তেইশ বছরের নাতি তাকে মুক্তি দেবে তার দায় থেকে।

নিশ্চিন্ত মনে সে মরতে পারবে। সত্তর বছরের পোড়াকপালে চাপড় মেরে

সে তাই বলে ছিল, 'মানিয়ে চলাটা আসল কথা, সামলে চলাটা আসল কথা। ওদিকে ওই বড়বাজারের লোকগুলি ঠকাতে চাইবে, এদিকে খদ্দেররা ঠকাতে চাইবে। দুদিক বুঝেশুনে নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিলে তবেই কিন্তু দোকান চলে।'

গোবিন্দ ভেবেছিল বুড়ো হেমেন্দ্র পিছনে থাকবে, সে নতুন করে ঢেলে সাজবে দোকানটা।

হেমেন্দ্র ভেবেছিল, আর তো এড়ানো যাবে না মরণ।

গোবিন্দের ঘাড়েই চাপিয়ে যাই সব দায়

তাই তো নিয়ম জগতের।

যৌবনকে দায় দিয়ে বুড়োর মরণ বরণ করা।

তেইশ বছরের যুবক কি বুঝবে বুড়ো বয়সে কত ব্যাকুলতা জন্মে, একজনকে দায় সঁপে দিতে—শান্তিতে জীবন কাটাবার সুযোগ পেতে।

না বুঝুক। না বোঝাই ভাল। যৌবনে না জানাই ভাল দেহে-মনে ঘনায়িত মৃত্যুকে কাছে নিয়ে অনুভব করেও জীবনের প্রতি কী মমতা জন্মায়?

জীবনের নতুন মালিকদের কীভাবে শুধু বলতে সাধ যায় যে, জীবনের দিকে তাকাও, জীবনের দিকে তাকাও, মরণকে তুচ্ছ করে জীবনকে সর্বজয়ী করে দাও, জীবন থেকে বাতিল করে দাও মৃত্যুর নিয়মটা।

নাতির চেষ্টায় দোকানের খানিকটা উন্নতি হতে দেখেই তার হাতে সব ভার তুলে দিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

বয়স কম হয় নি, পট করে একদিন সে মরে গেলে গোবিন্দকেই দোকানটা চালাতে হত। বেঁচে থাকতেই চালাক।

দু'জন কারা আজ বাড়ীতে খাবে গোবিন্দ বলে পাঠায় নি—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় নি বাড়ীর লোকের। কিছুদিন আগে বেশ বাবুগাছের দু'জন লোককে এনে বেশ সমাদরের সঙ্গে গোবিন্দ ভোজ খাইয়েছিল।

বয়সে দু'জনেই গোবিন্দের চেয়ে অনেক বড়—নগেনকে মাঝবয়সী বলা যায়।

তার চেয়ে বিপিনের বয়স কিছু কম। দুজনেই কাপড়ের ব্যবসায়ী, বড ব্যবসায়ী। হেমেন্দ্রের সঙ্গে কেবল জানাশোনা ছিল—গোবিন্দ একেবারে ভাব জমিয়ে বাড়ীতে এনে ভোজ খাইয়ে খাতির করতে শুরু করেছে।

কি করে করেছে সে-ই জানে।

পয়সাওলা লোক, বয়সে বড, গোবিন্দকে এভাবে ভাব জমাতে দেওয়া, খাতির করতে দেওয়া, কোন্ উপলক্ষ ছাডাই গোবিন্দের ডাকে বাডীতে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে বাধ্যবাধকতার মধ্যে পডতে রাজী হওয়া—একমাত্র গোবিন্দ ছাডা সকলেব কাছেই এটা বড় বেখাপ্পা ঠেকেছে।

একটা অজুহাত অবশ্য খাডা করা হয়েছে। এটা সখেব খাওয়া নয়—দরকারের খাওয়া।

ভুবন ও বিপিন দুজনেব বাডীই সহরের প্রান্ত ছাডিয়ে বেশ খানিকটা দূরে। সেদিন ব্যবসা সংক্রান্ত বিশেষ কাজে বাডী গিয়ে খেয়ে আসার সময় ছিল না—গোবিন্দ তাই তাদেব বাড়ীতে এনে খাইয়েছিল।

তাবা দুজনেই কোনদিন নাকি হোটেলে কিছু খায় না, খেতে পাবে না—তাদেব ঘেন্না করে।

সাজপোষাক চেহারায় এরকম খাঁটি সহুরে বাবুর মত দেখতে—তারা হোটেল বর্জন করে চলে সহরেব! এ কথাটাও খাপছাড়া মনে হয়েছিল সকলের।

হোটেলে না খেলেও যেন তারা নিজেদের মধ্যাহ্ন ভোজনেব একটা ব্যবস্থা করতে পারে না, একবেলা অন্ন ব্যঞ্জন ছাডা অন্য কিছু খেয়ে চালিয়ে দিতে পারে না।

একই লাইনের এত অল্প বয়সী এত ছোট একজন ব্যবসায়ীর কাছে ঘনিষ্টতা আত্মীয়তাব বাঁধনে বাঁধা পডবে জেনেও, তাদের বাড়ী বয়ে এসে ওই ছোকরার বাডীর রান্না অন্নব্যঞ্জন খাওয়া চাই।

নন্দন যখন বাজার করে ফিরল তার একটু আগেই নরেন চলে গেছে।

বাজারে চাকরী সম্পর্কে নরেনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে হয়েছিল, বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে সে বেরোবার জন্ত পা বাড়ায়।

গৌরী বলে, 'আবার যাচ্ছ কোথা?'

'নরেনের কাছে যাব। চাকরীটার বিষয় একটু জানবার আছে।'

'একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। তোমার হাতে কালিয়াটা ভারি সুন্দর হয়, মাছটা রেঁধে দিও।'

শুধু কথা নয়, গৌরীর গলার স্বর পর্য্যন্ত যেন মিষ্টি মনে হয়!

নন্দন চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একরকম রোজই তাকে এটা ওটা রেঁধে দেবার হুকুম করা হয়, এতদিন কিন্তু গৌরীব বলার ভঙ্গি গলার আওয়াজটাই ছিল আলাদা।

কালিয়াটা তার হাতে ভাল উৎরায় শুধু এই জন্মই যেন খুসী মনে গৌরী আজ ওই পদটা রেঁধে দেবার আব্দার জানাচ্ছে! হুকুম নয়, অনুরোধ!

তার চাকুরে বন্ধু তার নিজের আপিসে একটা চাকরী খালির সংবাদ দিয়ে গেছে। সংবাদটা শুনেই এই পরিবর্তন!

নন্দন বলে, 'তাহলে মাছটা রেঁধেই যাই।'

'না না, চাকরীর বিষয় জানতে যাবে, ওটা আগে সেরে এসো। জরুরী কাজ আগে সাবাই ভাল। শেষে ভুলে যাবে, নরেনের সঙ্গে দেখা হবে না—'

থেমে গিয়েই গৌরী যোগ দেয়, 'তা ছাড়া, ওরা তো খেতে আসবে সেই সাড়ে বারট একটায়।'

কতকাল পরে যে নন্দনের মুখে আজ একটু হাসি দেখা যায়!

'ব্যস্ত হচ্ছ কেন বৌদি? তেমন কিছু জরুরী কথা নয়—পরে গেলেও চলবে। মাছটা কেটে দাও, রেঁধে ফেলি।'

নগেন আর বিপিনকে নিয়ে গোবিন্দ আসে প্রায় দেড়টায়।

নন্দন বাইরের রোয়াকে বসে তারই মত বেকার পাড়ার ছেলে ভূপেশের সঙ্গে কথা বলছিল। নগেন নন্দনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছেন ?'

'আছি একরকম।'

'কিছু হল ?'

এটা ন্যাকামি—কিন্তু বেশ অমায়িকভাবেই নগেন প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। তার কিছু জুটে গিয়ে থাকলে গোবিন্দের কাছে জানতে যেন তার বাকী থাকত !

'কই আর হল ?'

বিপিন বলে, 'আপনাদের খালি চাকরী চাকরী বাতিক। ব্যবসা করুন, চাকরী করে কি কিছু হয় ? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ ব্যবসা করে খাচ্ছি, বড বড পাশ দিতে আপনাদের বুদ্ধি কত ধারালো হয়েছে, আপনারা নামলে আমাদের হটিয়ে অনায়াসে ফেঁপে উঠবেন।'

মাঝবয়সী মানুষটা তার সঙ্গে 'আপনি' করে কথা বলে—এটা সত্যই তাব পেটের বিদ্যার—তার এম. এ পাশ করার ক্ষমতার—সম্মান। নন্দন ভাবে, এই সব অল্পশিক্ষিত পয়সাওলা মানুষগুলি সত্যই কি ঈর্ষা করে গরীব বিদ্বানদেব, তারা বেকার হলেও ?

এই ঈর্ষার জন্যই কি ম্যাট্রিক ফেল নগেন তার দোকানে খাতা লেখার কাজটা পর্য্যন্ত তাকে না দিয়ে নিজের মত অল্পশিক্ষিত একজন বুড়োকে বহাল করে ?

প্রাণটা আজও কটকট করে ঘটনাটা মনে করলে।

খাতা লেখার কাজ ? পাঠশালার বিদ্যায় যা করা যায় ? তাই সই !

নন্দন ছুটে গিয়েছিল উমেদারী করতে।

নগেন তাকে কাজটা দেয় নি।

বলেছিল, 'আপনি পারবেন না মশায় এসব কি আপনাদের কাজ ! আপনারা আপিসে কাজ করবেন।'

'আপিসে কাজ পাই না যে।'

'পাবেন পাবেন—চিরকাল কি মানুষের সমান যায়? ওসব কি জানেন, কপালের কথা।'

পোড়া কপালের কথা বললেও তবু তার কথার একটা মানে হত।

হেমেন্দ্র তাদের সাদরে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানায়। বাড়ীতে যেন দু'জন মন্ত্রীর পদার্পণ ঘটেছে এমনি ভাবে কাচুমাচু করে।

কথা বেশী বলে নগেন। বিপিন একটু চুপচাপ মানুষ।

'আপনার নাতির সঙ্গে পারা যায় না মশায়। কাজের দায়ে একবেলা ঘরের ভাত নাই বা জুটল আমাদের—আপনারা কেন এত ঝন্‌ঝাট পোয়াবেন? দেখুন দিকি কাণ্ড। কিছুতে ছাড়বে না—বলে কিনা রান্নাবান্না সব হয়ে আছে, না এলে সব নষ্ট হবে। এ মোক্ষম যুক্তির তো কোন কাটান নেই!'

হেমেন্দ্র বলে, 'আপনাদের অনুগ্রহ। গোবিন্দের বড ভাগ্য যে আপনাদের স্নেহ পেয়েছে।'

'সামনে বলা উচিত নয়—বুদ্ধিমান ছেলে। এ বয়সে অল্পদিনে ব্যবসার কায়দা ঠিক বুঝে গেছে'

গোবিন্দ লজ্জিতভাবে একটু হাসে।

গৌরী ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করে। ছবিরাণীকে বিশেষভাবে আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে আসা বারণ!

খেতে খেতে তারা সহজভাবে একথা ওকথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু অস্বস্তি বোধ চাপতে পারে না! সকলেরই অস্বস্তি—তাদেরও, বাড়ীর লোকেরও।

শুধু গোবিন্দই যেন সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক ধরে নিয়ে খুসী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া ছাখে!

কত সুস্পষ্ট সহজবোধ্য এই বিশেষ মানুষ দুটির এ বাড়ীতে এভাবে বসে খাওয়ার অসঙ্গতি আর অস্বাভাবিকতা! ঠিক যেন একটা অন্যায় অসামাজিক ব্যাপার ঘটে চলেছে!

নন্দন ভাবে, ওরা কি সত্যই নাছোড়বান্দা গোবিন্দের আব্দার এড়াতে না পেরে এভাবে এখানে খেতে এসেছে?

আর কোন মানে নেই তাদের আসার? কিন্তু তাহলেও তো একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়—এত জোর কেন গোবিন্দের আব্দারের? কেন ওরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না গোবিন্দের আমন্ত্রণ? কেন ওরা গোবিন্দকে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না?

গোবিন্দ ওদের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। বিকালে নন্দন হাঁটতে হাঁটতে দোকানে গিয়ে গোবিন্দকে বলে, 'একটা কথা ছিল।'

'টাকা পয়সা নয় তো?'

'আরে না—অন্য কথা।'

জন দুই খদ্দের দোকানে বসেছিল, তাদের সামলাবার জন্য দীননাথ একাই যথেষ্ট।

গোবিন্দ রাস্তায় নেমে এসে বলে, 'কি কথা বড়দা?'

নন্দন কদাচিৎ দোকানে আসে, তার দোকানে আসাটা কেউ পছন্দ করে না। আজ হঠাৎ এভাবে এসে কথা আছে বলায় গোবিন্দ একটু ভড়কে গেছে।

নন্দন বলে, 'বলছিলাম কি, তোর একটু সাবধান হওয়া দরকার। তোকে আমি ভাল করেই জানি, তুই কি প্ল্যান করেছিস ভেবেচিন্তে তাও বুঝতে পেরেছি। আমার উচিত তোকে সাবধান করে দেওয়া, আমি কিন্তু কর্তালি করছি না বাবু, আগেই বলে রাখলাম। আমার যা বলার আছে বলছি, শুনে তুই যা ভাল বুঝবি করবি, আমি আর কথাটিও কইতে আসব না।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার এই লম্বা ভূমিকায় গোবিন্দ আরও ভড়কে গেল। দাদাকে সে এতটুকু গ্রাহ্য করে না—কেন করবে? কিন্তু যতই হোক এম. এ. পাশ করা দাদা তো, বোকা হাবা নয়। সে যখন এমনভাবে তাকে সাবধান করে দিতে এসেছে, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর! তাও আবার বাড়ীতে কিছু না বলে দোকানে বলতে এসেছে!

গোবিন্দ ওই কথাই বলে, 'কথাটা গুরুতর বলছ, বাড়ীতে না বলে দোকানে এসে—'

'বাড়ীতেও বলতে পারতাম। আজ না হয়, কাল হোক পরশু হোক এক সময় বললেই চলত। বাড়ীতে কেন বললাম না জানিস্? কথা শুনে তুই রেগে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়বি, না মারতে উঠবি, জানা তো নেই! বাড়ীতে জানাজানি হয়ে যাবে। তুই ধরে নিবি বড়দা শত্রুতা করেছে। দোকানে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললে রেগে চেঁচামেচি করতে পারবি না, কেউ জানবেও না কি ছেলেমানুষি করছিস। আমিও আর কথাটি কইব না। নিজে বুঝে শুনে তোর যা খুসী করবি—আমাকে জড়াতে পারবি না, দায়ী করতে পারবি না।'

গোবিন্দের মুখ এবার রীতিমত বিবর্ণ দেখায়। যতই ছোটখাট হোক দোকানের অবস্থানটি ভাল। বোধ হয় সেই জন্যই এত দিন চলে এসেছে। এতটুকু একটা ঘরের জন্য এত মোটা ভাড়া গুণেও।

বিকাল বেলা। পথের দুপাশে গিজ গিজ করছে চলমান মানুষ, ফুটপাতে এটা ওটা বিক্রীর জন্য সাজিয়ে নিয়ে, আর জুতো মেরামত জুতো পালিশ করে দিতে চেয়ে, অনেকগুলি ছোট বড মানুষ অস্থায়ী অনিশ্চিত জীবিকা অর্জনের লড়াই চালাচ্ছে।

রাগের মাথায় গুরুজন বলে গণ্য না করে বিশ্রী গাল পর্য্যন্ত কতবার গোবিন্দ তাকে দিয়েছে। আজ সে কথা কয় না। ভয়ে চুপ করে থাকে তার কথা শুনবার জন্য!

নন্দন গম্ভীর হয়ে আসল কথা বলে, 'আমি ভুবন বিপিনদের কথা বলছিলাম। খুঁটিনাটি জানি না, তবে মোটামুটি তোমার প্ল্যানটা আঁচ করেছি। একটু বেশী রকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটিয়েই তুমি প্ল্যানটা করেছ। তুমি বোকা নও, তুমি জানো যে ওদের ব্যবসাই হচ্ছে চোরামি—তার একটা দিক হচ্ছে তোমার মত ছেলে-মানুষদের ঘাড় ভাঙ্গা। ওরা কেমন লোক, তুমি তা ভালরকম জানো। তুমি

প্ল্যান করেছ ভাল। ওরা তোমার ঘাড় ভাঙতে চায়, তুমি ওদের কৌশল উল্টে দিয়ে নিজের কাজ বাগিয়ে নেবে।'

গোবিন্দ অভিভূত হয়ে বলে, 'ভারি আশ্চর্য্য তো, কেউ যা বোঝে নি, তুমি তা বুঝে গিয়েছ! ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা। ওরা ভাবছে, আমি ছেলেমানুষ, আমাকে সহজেই ফিনিস্ করতে পারবে। ভুবন আর বিপিন শালাকে কাত করে যদি না আমি উঠতে পারি তো—'

'থাম্।—চেঁচাস না।'

গোবিন্দ মাথা হেঁট করে।

নন্দন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আনে। দিনান্ত যত ঘনিয়ে আসছে তত বাড়ছে সহরের পথে গাদাগাদি করা ভিড়। কারখানায় আপিসে যারা আটক ছিল সকাল থেকে, জীবনের জন্য জীবনান্তক শ্রম করে তারা এবার বেরিয়ে আসছে।

তার ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়ে তার কথা শোনার জন্য গোবিন্দ অপেক্ষা করে আছে।

মনে মনে নরেনের হাসি পায়। তাকে কথায় কথায় ধমকানো ছিল যার অভ্যাস, ধমক খেয়ে তার এতটুকু রাগ হয় নি! তারই স্বার্থঘটিত ব্যাপার কিনা!

আজ সকালেই নরেনকে সে বলেছিল, বাড়ীর সকলে এতদিন যে ব্যবহার করে এসেছে তার সঙ্গে, এবার তার প্রতিকার করবে, প্রতিশোধ নেবে।

এই কি তার নমুনা?

গোবিন্দের ছেলেমানুষী মতলব বুঝে তার বিপদ টের পেয়েই ছুটে এসেছে তাকে সাবধান করে দিতে, মাধব আর বিপিনের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে।

কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে ঝানু ভুবন আর বিপিনের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে কাত হয় তো হোক না গোবিন্দ? তার কি এসে যায়? কিন্তু চুপচাপ থাকা গেল না কিছুতেই! ছোটলোকের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মানুষ হয়েছে কিন্তু ছোটলোক হবার সাধ্য বোধ হয় তার নেই।

'শোন্ বলি তোকে। বোকামি করিস্ না, একেবারে ডুবে যাবি। তুই গিয়েছিস্ ওই ঝুটো ঘুঘুর সঙ্গে চালাকির পাল্লা দিতে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর। দাদুকে সব জানিয়ে দে—দাদু সামলে দেবে।'

'দোকানটা বাড়াব ভাবছি যে? দাদুর সেই সেকেলে একরকম দোকান চালানো—'

'তাই চলুক না কিছুদিন? দোকানটা টিঁকে থাক, তোর বয়স বাড়ুক, জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা জন্মাক? দু'চার বছর পরেই নয় দোকানটা বাড়াবি?'

গোবিন্দ গোমড়া মুখে বলে, 'দেখি ভেবে। তুমি কিন্তু দাদুকে কিছু বোলো না।'

'আমার গরজ পড়েছে বলতে।'

কাছেই চায়ের দোকান, পথের ও পাশে। গোবিন্দ বলে, 'চা খাবে?'

'না।'

নন্দন আর দাঁড়ায় না।

৩

মণ্টু ঘন ঘন তার কাছে আসে।

সে মাঝে মাঝে মাধবের কাছে যায় বিস্তার জাবর কাটতে।

মণ্টু তার কাছে ঘন ঘন আসে সগৌরবে পরীক্ষা পাশের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার উপায় সম্পর্কে উপদেশ চাইতে, পরামর্শ করতে।

পাশ করা। প্রথম হয়ে, সেরা হয়ে পরীক্ষায় পাশ করা। এ ছাড়া মণ্টুর কোন চিন্তা নেই, কামনা নেই। উচ্চাশাও তার নেই।

সারা বাংলার যত ছেলে আগামীবার স্কুলান্তক পরীক্ষা দেবে তাদের সকলকে হারিয়ে সবার উপরে সে হতে চায় না। এতদিন যেটুকু তার কৃতিত্ব ছিল, তার স্কুলের

তার ক্লাশের শ' খানেক ছেলের চেয়ে এগিয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল—সেইটুকুই সে ফিরে পেতে চায়, বজায় রাখতে চায়।

'শুধু এই স্কুলে ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করে কি করবি মণ্টু?'

'ফার্ষ্ট হব, আবার কি?'

বড় হবে। সকলে প্রশংসা করবে। দীননাথ আনন্দে কেঁদে ফেলবে। বড় চাকরী পাবে। মা-বাবা ভাইবোনদের সুখে আরামে রাখবে। বিয়ে করে টুকটুকে বৌ ঘরে আনবে। দশজন মানী লোকের মধ্যে সম্মানের আসন পাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি কামনাগুলি সত্যই অস্পষ্ট মণ্টুর মনে।

অত সব সে বোঝে না। তার যেন শুধু জিদ যে সে বরাবর এই স্কুলে ফার্ষ্ট ছিল এবারও ফার্ষ্ট হয়ে পরীক্ষা পাশ করবে।

নিছক একগুঁয়েমি।

'পাশ না করে বড় হওয়া যায় না? কত মানুষ পরীক্ষায় কাত হয়েও জীবনে কত বড় হয়েছেন।'

মণ্টু এ সব কথার ধাঁধাঁ জানে।

'সে তো আলাদা কথা। সবার কি সব ক্ষমতা থাকে? আপনি চাইলেই পঙ্কজবাবুর মত গান গাইতে পারবেন, মানকরেব মত ক্রিকেট খেলতে পারবেন? যেটা যার ধাতে থাকে। আমার পড়ার দিকে ঝোঁক আমি পড়ব।'

নরেন টের পায়, উপায় ও পরামর্শ চেয়ে মণ্টু কেবল তার কাছেই আসে না এবং মণ্টুর পরীক্ষা পাশের সমস্যা একমাত্র তাকেই শুধু বিচলিত করে নি।

পাড়ার প্রৌঢ় উকিল বিনোদ যেচে তাকে পড়িয়ে ফার্ষ্ট করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে শুনে সে আশ্চর্য্য হয় না।

বিনোদও স্কুলে ফার্ষ্ট হত। খুবলে খুবলে প্রায় সব বিষয়ে বিদ্যাচর্চ্চার একটা ঝোঁক আজও বজায় আছে, সাহিত্য চর্চ্চার চেষ্টা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে চলে। বোধ হয় এই জন্যই ওকালতিতে তেমন পশার জমেনি, কোন রকমে চলে চায়।

নরেনকে সে বলে, 'তুমি নাকি মণ্টুকে বলেছ ভাল কোচিং ছাড়া ফার্স্ট হওয়া যায় না? খুব খাঁটি কথা। কিন্তু সমীরের মাষ্টার তো ভাল পড়ায়?'

'কিন্তু পড়ায় তো সমীরকে—সমীরের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে। ফার্স্ট যে হবে তাকে ফার্স্ট করার জন্য পড়াতে হবে।'

'আমিই পড়াব ভাবছি। দেখি যদি উৎরে দিতে পারি। মনে হয় ছেলেটার ফিউচার আছে।'

'পারবেন?'

এককালের ভাল ছাত্র এম. এ, বি.এল, বিনোদ আহত হয়ে বলে, 'একটা স্কুলের ছেলেকে পড়াতে পারব না?'

'সে রকম পারার কথা বলি নি। একটা ছেলেকে ভাল করে পড়ানো তো কম ঝন্‌ঝাটের ব্যাপার নয়।'

'কটা মাস চালিয়ে দেব।'

নরেন মনে মনে ভাবে, কটা মাস নয় চালিয়ে দিলেন, মণ্টু উৎরে গেল, কিন্তু তারপর কে চালাবে? মুখে সে আর কিছুই বলে না।

বিনোদ খুব উৎসাহ করে মণ্টুকে পড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু দু'চারদিনেই টের পাওয়া যায় যে নরেনেব আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়, এককালের ভাল ছাত্র হলেও তার দ্বারা একাজ হবে না।

এমনিতেই অবশ্য তার অকাজের সীমা নেই। যেচে যেচে পাঁচজনের দায় ঘাড়ে নিয়ে আর পরের উপর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই তার দিন যায়।

কিন্তু দেখা যায় মণ্টুকে পড়াতে না পারার কারণ মোটেই সেটা নয়। সকালে বিকালে এক ঘণ্টা করে পড়াবার সময় সে করে নেয় কিন্তু পড়াতে গিয়ে টের পায়, ছেলে পড়ানোটা একেবারেই তার ধাতে নেই।

মণ্টুকে পড়াতে হলে তাকে বেশ কিছুদিন খেটেখুটে ছেলে পড়ানো শিখতে

হবে। এ তো বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ নয়—কতগুলি বই পড়ে ছেলেদের পরীক্ষা পাশ করার উদ্ভট ব্যবস্থা। বই পড়ানো আর পরীক্ষা সবই যেন একেবারে উদ্ভট আর জটিল এক জগাখিচুড়ি ব্যাপার।

সেই কবে এককালে স্কুলে এসব পড়েছিল, এতকাল পরে কি কিছু মনে থাকে? কত কিছু অদল বদলও হয়ে গেছে।

'না বাবা, আমার দ্বারা হল না!'

তবে বিনোদ জেদি মানুষ। নিজে পড়াতে না পারলেও মণ্টুর জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নিশ্চয় সে করে দিত

হঠাৎ সে চলে গেল জেলে।

সহরে সেদিন হরতাল হবে। বিনোদ রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। কিন্তু হরতালটা ডাকা হয়েছিল ভাত-কাপড়ের দাবীতে। চারিদিকে ভাত-কাপড়ের অভাবে মানুষ কি রকম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভাল করেই সেটা তার নজরে পড়ছিল।

হরতালের খবর শুনেই বলল, 'হাঁ হাঁ, হরতাল হওয়া উচিত। মানুষ না খেয়ে মরবে নাকি? ন্যাংটো হয়ে থাকবে?'

চারিদিকের গাঁ থেকে দলে দলে চাষীরা এসে সহরে জমে, শোভাযাত্রা করে সহরের রাজপথে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে বিনোদ একেবারে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় শোভাযাত্রার।

তারপর হয় পুলিসের হামলা। হাঙ্গামা হয় জবর। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আহত হয়ে বিনোদ জেলে চলে যায়।

মাস কয়েক পরে টেষ্ট। তারপর আসল পরীক্ষা। আশা কি ব্যর্থ হবে মণ্টুর? দীননাথের? স্কুলের কর্তৃপক্ষের? এতকাল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসে আসল পরীক্ষায় শুধু ভালভাবে পাশ করাই সার হবে, অসাধারণ কিছু করতে পারবে না?

কেবলমাত্র এই কটা মাস নিয়মমত একজনের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগটুকুর অভাবে ?

দীননাথ বলে, 'আমার যদি টাকা থাকত রে মণ্টু— !'

সকালে কাজে বেরিয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত দীননাথ কাতরভাবে বার বার অধ্যয়নরত ছেলের দিকে তাকায়। রাত জেগে পড়েছে, আবার অন্ধকার থাকতে উঠে পড়তে বসেছে। ভাঙ্গা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে বসে পড়ে'ই ছেলে তার দেখিয়ে দিতে পারত পরীক্ষায় পাশ করা কাকে বলে।

একজন মাষ্টারের অভাবে সে কাবু হয়ে যাবে। প্রথম দু'চার জনের মধ্যে যার ঠাঁই পাওয়া সম্ভব, স্কুলের মাষ্টাররা পর্য্যন্ত যেটা আশা করে, সে ছেলে শুধু ভালভাবে পাশ করতে পারবে !

চোখ ফেটে জল আসতে চায় দীননাথের। বুকের মধ্যে জ্বালা করে।

সে একরকম কিছুই করে নি ছেলের জন্য। শুধু এত বড় ছেলে থাকতেও সংসারেব ছোট বড কোন ঝনঝাটে তাকে না জড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা করার সুযোগটা দিয়েছে। ছেলের নিজের গুণেই ব্যবস্থা হয়েছে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার। তার যদি ক্ষমতা থাকত ক'মাসের জন্য একজন মাষ্টার রেখে দেবার ! এইটুকু যদি সে করতে পারত ছেলের জন্য !

'হ্যাঁরে, কত লাগে একজন মাষ্টার রাখতে ?'

'সে অনেক লাগে। ভাল মাষ্টার হলে পঁচিশ তিরিশ টাকার কম নয়।'

'ও বাবা !'

শিক্ষকদের সহানুভূতি আছে। ক্লাশে আর কোচিং ক্লাশে তার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়। বাইরেও প্রশ্ন করলে সযত্নে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিনা পয়সায় তাকে নিয়মিত পড়াবার সাধ্য তাদের নেই। দু'বেলা ছেলে পড়িয়েও তাদের পেট চলতে চায় না।

খানিক পরে আবার আপশোষ করে দীননাথ বলে,' তোর পড়াশোনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না আমি।'

'তুমি যে এত কষ্ট করছ?'

'হাঃ! কষ্ট ওমনিও করতাম, এমনিও করছি। তোর জন্য করলাম কচুপোড়া।'

দীননাথের মুখে বেদনার সঙ্গে একটু বিহ্বলতার ছাপ। দেখে বড়ই কষ্ট হয় মণ্টুর। মানুষটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে খাটে, তার উপরে আবার একলা ঘর সংসারের সব দায় মেটায়।

সে সংসারের খুঁটিনাটি দায় বইতে চাইলেই দারুণ অখুসী হয়ে বলে, 'ছি ছি নিজের দায় বুঝিসনে তুই? কি বলব তোকে! তোর কাজ তুই করে যা দিকি নিজের মনে। মস্ত বিদ্বান হবি, কেউকেটা লোক হবি নাম যশ পাবি—মোকে তখন মোটর চাপাস্। তোর খুচ খাচ ব্যাপারে নজর দেয়া কেন? দু'বার সওদা এনে দিয়ে তুই রাজা করবি মোকে?'

কি রকম হয়ে গেছে মুখটা তার বাবার? কেমন একটা শুকনো রুক্ষ ম্যাজমেজে ভাব।

মণ্টু জোর দিয়ে বলে, 'তুমি এত ভাবছ কেন? ফার্ষ্ট সেকেণ্ড না হই, অনেক ছেলেদের তো টেক্কা দিয়ে যাব। আর পরীক্ষা নেই? সেগুলোতে দেখা যাবে।'

কী আশা! প্রথম আসল পরীক্ষা সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কতগুলি পরীক্ষার কথা ভাবছে মণ্টু।

অবশ্য তা না ভাবলে প্রথম আসল পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না।

দীননাথ কিন্তু তার কথায় ভরসা পায় না।

'খাড্ হয়ে যাচ্ছিস যে!'

'হলাম বা? একবার হলে কি হয়?

দীননাথ সারাদিন দোকানে খেটে বেঁচে আছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে বৌ আর ছেলেমেয়েকে। সে কি ছেলেমানুষের এই মন ভুলানো কথায় ভোলে? কিন্তু কিছুই তো করার নেই তার, মুখে বেশী আপশোষ করে ছেলেটাকে অনর্থক বিব্রত করে আর লাভ কি হবে?

তাই চিরদিন যেমন হাসিমুখে স্নেহ মেশানো দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে এসেছে তেমনিভাবে তাকাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'তুই যদি বলিস্ তবে আর কথা কি!'

পথে বেরিয়ে নরেনের সামনে পড়ে সেদিন সে কেঁদে ফেলে।

কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে যে কথাটা নরেন নাড়াচাড়া করছিল দীননাথের কান্নার আঘাতে এক মুহূর্তে সেটা সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে যায়।

নরেন বলে, 'ভেবো না, আমি তোমার ছেলেকে পড়াব। পারব কিনা জানি না, চেষ্টা করে দেখব।'

দীননাথ কথা বলতে পারে না, তার হাত চেপে ধরে আবার কেঁদে ফেলে।

নরেন সোজা সরু গলির ভিতরে ঢুকে পড়ে। মণ্টুর পাশে ছেঁড়া মাদুরে বসে বলে, 'আমি তোকে পড়াব মণ্টু।'

আনন্দে বিহ্বল হয়ে মণ্টু শুধু চেয়ে থাকে।

'এইখানে এসে পড়াব—দু'বেলা। তোর যেতে হবে না। এখানে বসে পড়া অভ্যাস, এখানেই পড়ায় বেশী মন বসবে।'

খবর জেনে নরেনের বাড়ীর লোক বড়ই অসন্তুষ্ট হয়।

তারিণী বলে, 'তুমি নিজের ভাইকে নিয়ে পাঁচ মিনিট বসার সময় পাও না, পরের ছেলেকে বিনা পয়সায় দু'বেলা পড়াচ্ছ!'

'বরেনকে পড়িয়ে কি হবে?'

'কি হবে মানে? ওর মাথা নেই, ওকেই তো ভাল করে পড়ানো দরকার। নইলে ফেল হয়ে যাবে যে।'

'তোমরা যা পড়াচ্ছ তার বেশী ওর দরকার হয় না।' হাজার বেশী পড লেও ওটুকুর বেশী ওর মাথায় ঢুকবে না।'

মা বলে, 'পরের ছেলের জন্য ওর যত মাথা ব্যথা। নিজের ভাই ফেল করলে বয়ে গেল।'

তারিণী আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'কি যে সব খাপ ছাড়া কাণ্ড তোমার কিছুই বুঝি নে। ভবেশ বাবু ছেলেমেয়ের জন্য একজন মাষ্টার খুঁজছেন, ওদের পড়ালে তো ঘরে কটা টাকা আসতো? তার বদলে তুমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ। এদিকে অভাবের অন্ত নেই।'

নরেন বলে, 'আপনারা বুঝছেন না কথাটা। মানুষের খেয়াল খুসী থাকবে না, কোন সখ থাকবে না? ওকে যে আমি পড়াচ্ছি, এটা আমার কাছে সিনেমা দেখা, খেলাধুলা করার মত-ওকে পড়িয়ে আমি আনন্দ পাই। একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ?'

শুনে মা-বাবা নির্ব্বাক হয়ে যায়।

উষা বলে, 'বিয়ে করতে বলছি সবাই—'

তার কথা কানে না তুলে নরেন আবার বলে, 'ওকে না পড়িয়ে আমি যদি সকাল সন্ধ্যা তাস-পাশা খেলে কাটাতাম, তোমরা কিছু বলতে? সেই সময়টা আমি অন্য একটা খেয়াল মেটাতে চেষ্টা করছি।'

সোজা খাটুনি একটা ছেলেকে স্কুলান্তক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হবার জন্য তৈরী করতে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া।

ছেলে পড়ানো অভ্যাস ছিল না—তবে নিজে স্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়েছে অল্পদিন আগে। পড়া আর পড়ার খুঁটিনাটি কায়দাকানুন বিনোদের মত ইতিমধ্যে সব ভুলে যায় নি।

কিন্তু মণ্টুকে পড়াতে পড়াতে বারবার তার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে, দেহ মনে রীতিমত ক্লান্তি বোধ হয়।

চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে মণ্টুর এই পরীক্ষা পাশের কৃতিত্বের নিষ্ফল ভবিষ্যৎ। বৃত্তি পেলেও, পড়া চালিয়ে যেতে পারলেও, বিশেষ কিছু সে আর করতে পারবে না এই লাইনে।

গরীবের ছেলে কি পাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে না? সেরকম দৃষ্টান্ত কি নেই?

আছে বৈ-কি!

তারা অসাধারণ। মণ্টুর মত সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে না।

মণ্টুর সে গুণ নেই। সে নরম। তার বড় হবার স্বপ্ন শুধু মা বাবা ভাই-বোনদের কষ্ট দূর করা।

ঘেরা রোয়াকটুকুতে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মণ্টুর মা রান্না করে আর থেকে থেকে মুখ তুলে তাদের দিকে তাকায়। বিষণ্ণ শুকনো মুখে মালতী ঘরের কাজ করে যায়।

মালতীকে দেখে মনে হয় তার বোধ হয় কোন অসুখ আছে।

ছোট ছেলেমেয়ে কটা বাইরে কোথায় খেলছে। মাঝখানে একবার বাড়ী এসেছিল, মালতীর ধমকে আবার পালিয়ে গেছে। মণ্টুর পড়ার সময় তাদের বাড়ীতে খেলা করা বারণ।

বাড়ীর মধ্যে রোজ দু'তিন ঘণ্টা এভাবে বসে থাকার ফলে আপনা থেকেই এই অশিক্ষিত গরীব পরিবারটির চালচলন নজরে পড়ে নরেনের। কতকালের পুরনো কত অন্ধকার যে জমাট বেঁধে আছে এদের চেতনায়! কত সংস্কার, কত অন্ধবিশ্বাস কত ভীরুতা!

কিন্তু সমালোচনা জাগে না নরেনের মনে।

তাদের শিক্ষিত পরিবারে মানুষগুলির চেতনা তো মুক্ত নয় এসব সংস্কার, বিশ্বাস আর ভীরুতা থেকে!

কতগুলি কেবল তলিয়ে গেছে মনের তলায়, কতগুলির ঘটেছে রূপান্তর।

মিলিয়ে যায় নি, শেষ হয়ে যায় নি— নূতন ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে নি সেগুলির স্থান দখল করে।

তবে অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জন্মেছে প্রচণ্ড। যেমন তাদের শিক্ষিত পরিবারের মানুষগুলির মনে, ঠিক তেমনি এই বাড়ীর অশিক্ষিত মানুষগুলির মনেও।

একদিন এই বিক্ষোভ চেতনায় সংস্কার ও ভীরুতার নাগপাশের বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে দেবে বৈ-কি!

একটি অন্ধ বিশ্বাসে আশ্চর্য্য মিল তাদের শিক্ষিত এবং এদের শিক্ষায় বঞ্চিত পরিবারে। এরা যেমন অন্ধের মত বিশ্বাস করে যে পরীক্ষা পাশ করলেই রাজা হওয়া যায় তাদের বাড়ীর মানুষেরাও ঠিক তেমনিভাবে এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে।

বরেনের বেলাতে পর্য্যন্ত তাই অসাধ্য সাধনের এত চেষ্টা!

চারিদিকে কত পাশ করা বেকারের দুর্গতির অন্ত নেই, সে সব চোখে দেখেও ভুল ভাঙ্গে না।

লাখ লাখ পাশ করা আর মুর্খ মানুষের জন্য চাকরী আর কাজের কোন ব্যবস্থাই নেই—জেনেও খেয়াল হয় না যে চাকরী আর কাজের ব্যবস্থা না হলে শুধু পাশের লড়াই চালিয়ে যাওয়া বোকামি।

এত দুর্ভোগের পরেও নন্দনের পর্য্যন্ত চেতনা হয় নি যে পাশ করা আর চাকরী পাওয়ার আসল ব্যাপারটা কি!

কিন্তু সেও কি বুঝে ফেলেছে এ গলদের শিকড় কোথায়? তার চেতনা থেকে কি সাফ হয়ে গিয়েছে এই অন্ধ বিশ্বাসের জঞ্জাল?

মাধবকে সে বলে, 'কিন্তু দোষটা কি, ভুলটা কোথায়? দেশে শিক্ষাই কম, ভীষণরকম কম। পাশ করে চাকরী পাবার আশাতে হলেও, যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তার সুযোগ নিয়ে লেখা পড়া শেখা তো দোষের নয়। মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শ হোক, জীবিকার জন্যও তো শিক্ষা?'

মাধব বলে, 'অব্যবস্থার দুটো দিককে জড়িয়ে দিচ্ছেন। একদিকে শিক্ষায় ভাল ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা নেই।'

নরেন মাথা নেড়ে বলে, 'ওদিক দিয়ে বলি নি কথাটা। লোকে জানছে যে হাজার হাজার ছেলের চাকরী হবে না—চাকরীই নেই। তবু এত টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে পড়ায় কেন? বরং পড়ার টাকাটা জমিয়ে দোকান দিলে—'

মাধব হেসে বলে, 'সবাই দোকান দিলে কে কিনবে?'

'একটু খোলসা করে বলুন।'

মাধব সিগারেট ধরায়।

'আপনি গোড়ার গলদটা ভুলে যাচ্ছেন—অনেক লোকের জীবিকা অর্জনের কোন ব্যবস্থাই নেই। যে সিস্টেম চালু আছে তাতে এরা বাড়তি লোক, ফালতু লোক—এদের কাজ দিয়ে খাটালে প্রফিট বাড়বে না। এদের যে পরিমান বেতন দেওয়া হবে সেটা প্রফিট থেকে কাটা যাবে। একটা ছেড়ে আরেকটা ধরে তাই লাভ নেই, সেখানেও এক অবস্থা। সিস্টেমটা না পাল্টালে একটা মোট সংখ্যা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হতেই পারে না। তিন হাত চাদর দিয়ে কি চার হাত বিছানা ঢাকা যায়? এদিক টানলে ওদিক—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মানসী বলে, 'ঠিক খাটো শাড়ীর মত। আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।'

এটা তার খোঁচা। সত্যই তার পরণে সস্তা না হলেও খাটো একখানা শাড়ী। কেনার সময় মাধবের খেয়াল থাকে নি যে শাড়ী শুধু পছন্দ করে কিনলেই হয় না, ক'হাত শাড়ী সেটাও জিজ্ঞাসা করে কিনতে হয়।

খাটো শাড়ীখানা বদলানো যায় নি।

মাধব ক্যাশমেমো হারিয়ে ফেলেছিল।

একটু চুপ করে থেকে মাধব বলে, 'তাছাড়া, আপনাদের আরেকটা ভুল ধারণা আছে। ভদ্রসমাজে শুধু চাকরীর জন্য লেখাপড়া শেখে না। জীবিকাটা নিশ্চয়

দরকার মানুষের, কিন্তু শুধু পেটে খেয়ে মানুষের চলে না। মানুষের একটু সংস্কৃতিও দরকার।'

নরেন বলতে যায়, 'সংস্কৃতি কি শুধু—'

মাধব জোর দিয়ে বলে, 'না না, কেবল শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি দরকার, তা বলি নি। সমস্ত মানুষ বোঝাতেই আমি মানুষ কথাটা ব্যবহার করেছি। সব মানুষের সংস্কৃতি দরকার—চাষী মজুর থেকে সকলের।'

মানসী প্রশ্ন করে, 'বুনো অসভ্য মানুষের?'

'তাদেরও দরকার—তাদেরও সংস্কৃতি আছে। তারা শুধু তুলনায় অসভ্য—ওই অবস্থাটাই এককালে মানুষের সবচেয়ে সভ্য অবস্থা ছিল। বুনো মানুষদেরও নিশ্চয় সংস্কৃতি আছে।'

'সংস্কৃতির মানে তা হলে দাঁড়াচ্ছে—'

'সংস্কৃতির মানে ছোট করে ধরা হয়। প্রকৃতিকে জয় করে জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য যা কিছু করা দরকার যা কিছু থাকা দরকার সব কিছুই মানুষের সংস্কৃতি।'

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এসে পড়েছে খেয়াল করে নরেন বিস্ময় বোধ করে। মণ্টুর পরীক্ষা আর নন্দনের চাকরীর বাস্তব সমস্যা থেকে একেবারে মানবিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যায়।

কিন্তু যোগাযোগটা তো মিথ্যা নয়!

মণ্টুর অসল পরীক্ষার মাসখানেক বাকী ছিল।

সকালে তাকে পড়িয়ে যথাসময়ে আপিসে গিয়ে নরেন জানতে পারে, তার চাকরী নেই।

শুধু সে একা নয়, আরও তেরজন চাকরী করে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

আঘাতটা পড়েছে তের জনের উপর। কিন্তু কেবল তাদেরই মনে হয় নি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের কথাটা, আপিসের আরও প্রায় সাড়ে চারশ'র মত কেরাণীর অনেকেরই এই রকম মনে হয়েছে।

নরেন বাড়ী ফেরার পর বাড়ীর লোকের তো আর কোন উপমা মনেই আসে নি।

খবরটা চেপে যাওয়ায় গোড়ার কয়েকদিন পাড়ার লোক জানতে পারে নি— ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছে। নইলে তাদের মধ্যেও কত জন ব্যাপারটাকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মনে করেছে আন্দাজ করা যেত।

ধরাবাঁধা ধারণা দিয়ে, উপমা দিয়ে, ব্যাপার বোঝার মানসিক অভ্যাস বেশ কিছুদিন থেকে কেটে যেতে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু আজও উপমা ছাড়া যেন ধারণাশক্তির উপায় নেই। কোনরকম উপমা ছাড়াই সব ব্যাপার ঠিক মত আঁচ করতে পারা মানেই তো জীবন ও চেতনায় বিপ্লব ঘটে যাওয়া!

মেঘ কি কম ঘনিয়েছে জীবনের আকাশে! যৌবনের দিন দুপুরে পর্য্যন্ত কি কম আঁধার ঘনিয়েছে। চোখে পড়তেও কি বাকী আছে ওই আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ?

তবু চাকরী করতে করতে বিনা নোটিশে আচমকা ছাঁটাই হওয়াকে মনে হয় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

মনটা কতদূর যন্ত্র দাঁড়িয়ে গেলে আকস্মিক বিপদ এরকম যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আনতে পারে!

কতকাল ধরে যন্ত্র বানাবার চেষ্টা চলে এসেছে তাদের মনকে!

কিন্তু কই, এই নিয়মে যন্ত্রের মত শুধু হা-হুতাশ করে চলে না তো বাড়ীর মানুষ আপনজনেরা!

হতাশায় মুষড়ে পড়ে শুধু তো কপাল চাপড়ায় না!

বিনা মেঘে বজ্রের আঘাতে কাবু হবার_ বদলে নাথবাত্র খানিকটা হা-হুতাশ করে প্রতিবাদের সোরগোল তুলে দেয়।

তাকেই দায়ী করে, দোষী করে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটার জন্য !

এত বড় দুর্ভাগ্যের খবরটা বাড়ীতে কি করে জানাবে ভেবেই নরেন কাবু হয়েছিল সব চেয়ে বেশী।

সকলের কত আশা, কত ভরসা, তার এই চাকরীর উপর ! চাতকের মত সকলে শুধু তার মাসকাবারী বেতনের এক পশলা বর্ষণটুকুর আশায় তাকিয়ে থেকে দিন গোনে না, কত আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে কল্পনারও মালা গাঁথে।

খেয়ে দেয়ে যথাসময়ে যথারীতি চাকরী করতে বেরিয়েছে, ফিরে গিয়ে কোন মুখে সে ওদের জানাবে যে পরদিন থেকে ন'টায় তার ভাত দরকার হবে না, চাকরী করতে বেরোবার প্রয়োজন হবে না !

দেড মাসের মাইনের টাকা এনেছে, সামনের মাস থেকে আর মাইনে আনবে না !

মা বাবা ভাই বোন কি বলবে কি করবে, কল্পনা করার চেষ্টা করেছে আর অন্ধকারে ভয়ের স্থানে ছেলেমানুষের আতঙ্কের মতই সেদিন সে আতঙ্ক অনুভব করেছে বাড়ী ফিরতে !

রাত দশটার আগে বাড়ী ফিরতে পারে নি।

চাকরী গেছে। কোথায় নিদারুণ হতাশায় একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে তার বদলে নিজের ভিতরকার একটা অস্থির উন্মাদনার তাডায আর বাড়ীর মানুষের ভয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে রাত দশটা পর্য্যন্ত !

পায়ে হেঁটে ঘুরে বেডিয়েছে !

পকেটে এক মাসের পাওনা আর বিনা নোটিশে তাড়ানোর জন্য আধ মাসের ভিক্ষা দেওয়া মাইনের টাকাগুলি কিন্তু ট্রামে বাসে পর্য্যন্ত সে ওঠে নি।

কয়েক আনা পয়সা বাঁচাবার জন্ম নয়।

ট্রামে বাসে উঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসবার কথা ভাবতেই তার মন বিগড়ে যাচ্ছিল।

দশটার পর বাড়ী ফিরে রাত্রে সে কিছু ফাঁস করে নি।

পরদিন সকালে জানিয়েছে।

কিন্তু বাড়ীর লোক কি আর বলবে। কতই আর হা-হুতাশ করবে। কত সমবেদনা দেখাবে এই তুর্দিনের বেকারকে ?

তাই যেন ওদিকেই কেউ যায় না। আঘাতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর হতাশায় কিছুটা মুখ কালো করে সকলে কিছুক্ষণ ব্যাজার হয়ে থেকে দোষারোপের সোরগোল তুলে দেয়।

দেশে বেকার অনেক কিন্তু চাকরীও তো করছে অনেক লোক। এই পাড়ারই অনেক পাশ করা ছেলে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে চাকরীর জন্য—কিন্তু চাকরীও কি পাচ্ছে না বা করছেও না একজনও ?

রোজগেরে চাকুরে মানুষের দলে ভিড়েও, এতদিন চাকরী করেও, তুই শেষে এমনভাবে বেকারের দলে এসে ভিড়লি! সব দোষ তোর। মানিয়ে চলতে পারলে কি তোর এ দশা হয় ? চাকরী যায় ?

চিরকালের অবুঝ একগুঁয়ে সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ছেলে। এ ছাড়া তার কি গতি হবে ?

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়। তাকেই শেষ পর্যন্ত দোষী ঠাউরে নিল বাড়ীর মানুষ ? এত ছেলের সঙ্গে বরেনের ফেল করার অপরাধের মত তারই ঘাড়ে চাপল চাকরী খোয়ানোর দায় ? সেই হল অপরাধী ?

বাড়ীর লোকে খুসী হবে না এটা তার জানাই ছিল। কিন্তু তার উপরে এতখানি বিরূপ হবে, সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে এমন বিশ্রী ব্যবহার সুরু করবে তার সঙ্গে, এটা সে ভাবতেও পারে নি।

পাশ টাশ করে প্রায় এক বছর কাজের চেষ্টায় বেকারির সময় ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী তিতো হয়ে উঠছিল সকলের ব্যবহার, দুবেলা রেশনের পচা দুর্গন্ধ চাল আর খারাপ গমের রুটিতে ভাগ বসাবার জন্য মা পর্য্যন্ত যেন তাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছিল।

মামার চেষ্টায় একটা চাকরী পেয়ে সেটা হাবিয়ে আবার বেকার হবার কটা দিনের মধ্যে সকলের কাছে সে যেন চোর ছ্যাঁচড়ের চেয়ে অধম ঘরের শত্রু দাঁড়িয়ে গেছে!

শুধু অবজ্ঞা করা নয়, তাকে ভাত খেতে না ডেকে, নিজে গিয়ে আসন পেতে খেতে বসলে তাকে ভাত দিতে স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখিয়ে, তাকে যেন আঘাত কবতে চায় মা আর বোনেরা!

এক সকালের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন!

চাকরী পেয়ে সেও হাঁফ ছেড়েছিল, আশা আনন্দেব উন্মাদনায় রাতারাতি সকলের কাছে আদবেব খাতিরের মানুষ হয়ে ওঠাটা তাব নিজের কাছেও কিছুমাত্র খাপছাড়া ঠেকে নি।

চাকরী পাওয়ার আশা আনন্দের উত্তেজনা তারও কেটে গিয়েছিল বাড়ীব লোকেরও কেটে গিয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যে—সে কিছু রোজগার করে সংসাবে দেওয়ায় কয়েকটা মারাত্মক সমস্যাব সমাধান হয়েছিল, পবিবারটির ভেঙ্গে চুবমাব হওয়া ঠেকানো গিয়েছিল—কিন্তু অভাব ঘোচে নি।

অনেক অভাব। যেন অন্ত নেই টানাটানির!

অভাব অনটনে পীড়িত মানুষের কি আনন্দ টেঁকে?

এক বছরের জীবনপণ চেষ্টা অবশেষে মামার দয়ায় সার্থক হয়েছে, নরেন একটা চাকরী পেয়েছে, এটা দু'একদিনের জন্য আনন্দে পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু একঘেয়ে একটানা কষ্টকর বাঁচা ঠিক যেন নেশার সাময়িক বাঁকা আনন্দের মতই শুষে নেয় এই খুসী হওয়ার রসটুকু।

তবু তার আদর আর খাতির বজায় ছিল।

তার আপিসের ভাত র'াধতে হবে ন'টার মধ্যে, আপিস থেকে ফিরলেই সে যাতে মুখ হাত ধোয়ার জল পায়, চা আর জলখাবার পায়, সে ব্যবস্থা করতেই হবে —টুঁ শব্দটি না করে।

বেকার হবার পর অন্ততঃ ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে তো কমা উচিত ছিল তার এই আদর আর খাতির? এমন বেহায়ার মত মা বোনেরা পর্য্যন্ত কদিনের মধ্যে আদর আর খাতিরের পাট তুলে দিয়ে বিরাগ দেখানো আর ঘা-মারার পাট সুরু করল কি করে!

অনেক ভেবে চিন্তে নবেন এক ধরণের একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাড়ীর লোকদের বিরুদ্ধে।

সে অবশ্য ভাবে তার এটা ভীষণ রকম বিদ্রোহ ঘোষণা, প্রায় বিপ্লব করে ফেলার কাছাকাছি।

কিন্তু আসলে এটা যে তার আত্মরক্ষার চেষ্টা—মেয়েলি মার্কা চেষ্টা—সেটা তার ধারণাতেও আসে না।

সে বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

তাকে কেউ খেতে ডাকে না এই অজুহাতে।

তার জন্য রান্না হয়—সেও জানে যে রেশন আর এভাবে ওভাবে সংগ্রহ করা —পয়সা দিয়ে সংগ্রহ করা—খাদ্য অন্য সবার মত তার জন্যও প্রস্তুত হয়েছে। কেউ বলে নি যে চাকরী গেছে বলেই সে খাবে না।

তবে অন্যদের ডেকে তাগিদ দিয়ে খাওয়ানো হয় ওই খাদ্য, তাকে কেউ খেতে ডাকে না।

সে তাই ঠিক করে না ডাকলে খেতে যাবে না।

সকালের চা-খাবার। দুপুরের ডাল ভাত। রাত্রের রুটি ছেঁচকি। কিছুই খেতে যাবে না—না ডাকলে।

তার এই বিদ্রোহে ফল হয়।

একেবারে অপ্রত্যাশিত ফল।

খেতে তাকে ডাকা হয়, কিন্তু এমন ভাবেই ডাকা হয় যে অপমানে অভিমানে জ্বলে পুড়ে যায় তার হৃদয় মন।

বিদ্রোহ সুরু করার প্রথম দু'তিনটে দিন সকলের খাওয়া হবার পর বিরক্তভাবে গম্ভীরভাবে তাকে খেতে ডাকা হয়।

তারপরে সুরু হয় প্রতিক্রিয়া।

চা জল খাবার খেতে ডাকা হয় এইভাবে : কি আরম্ভ করেছ শুনি? খাবার আগলে বসে থাকব নবাব সায়েবের জন্যে? ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে নামিয়ে চা গরম করে দিতে হবে বাবুকে?

দুপুরে ঝাঁঝের সঙ্গে বলা হয় : পিণ্ডি গিলবি না? কটা বাঁধুনী বামনী ঝি-চাকর রেখেছিস্ যে হেঁসেল আগলে বসিয়ে রাখিস?

কথাটা বলে মা!

উষা সেই সঙ্গে ফোঁড়ন কাটে, 'তোমার সত্যি বিবেচনা নেই দাদা, বড্ড তুমি স্বার্থপর। নিজের আরাম আয়েসটা বড্ড বেশী বোঝ।'

'আমি খাব না।'

'কথাটা বললেই হত সময়মত? এক পয়সা রোজগার নেই, রাগ আছে দারোগার মত!'

না খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে বাইরে যে অপমান জোটে, তা যেন তুচ্ছ হয়ে যায় বাড়ীর মানুষের গায়ের জ্বালায় পরিবেশন করা এই সব ঘরোয়া অপমানের কাছে।

নন্দনের বোধ হয় এরকম অপমান জোটে না। সে তো চাকরী পেয়ে চাকরী হারিয়ে বেকার হয় নি!

তবে বিয়ে খানিকটা বিবক্ষয়ও হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেই সে টের পায়, মা আর উষার মধ্যে ঝগড়া বেধেছে।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি কুৎসিৎ ভাবেই পরস্পরকে আক্রমণ করছে তার মা আর বোন! কি রকম বিশ্রীভাবে বিগড়ে গেছে দু'জনের মেজাজ।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে নরেন তাদের গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করার কথাগুলি শোনে।

থেকে থেকে তারিণীর গর্জন করা ব্যর্থ ধমক শোনে।

হঠাৎ সশব্দে একটা চড় পড়ে উষার গালে।

উষা সশব্দে কেঁদে ওঠে।

আঠার বছরের মেয়ে!

মার হাতে গালে চড় খেয়ে তাকে কাঁদতে হয়।

নিজের মনে নিরিবিলি একটু বসবার যায়গা নেই বাড়ীতে।

বাড়ীতে মানে তাদের ভাড়া করা বাড়ীর দু'খানা ঘরে অংশটুকুতে।

বিনয় বাবুর বাড়ীর সামনের রোয়াকটুকুতে বসে বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে তর্কের আসর জমিয়েছে পাড়ার মাঝবয়সী দশবার জন চাকুরে।

জানালায় বসে বিড়ি টানতে টানতে নরেন ওদের তর্ক শোনে—বাড়ীর মানুষের কথাবার্তা শোনে।

তর্ক শুনে মনে হয় সকালবেলা খবরের কাগজে যা পড়েছিল সম্পাদকীয় এবং সংবাদ তারই মুখস্থ করা পুনরাবৃত্তি নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

বাড়ীর মানুষের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, এইমাত্র মায়ে-ঝিয়ে যে ঝগড়া হয়ে গেল প্রাণের জ্বালায় তারই জের টেনে চলেছে মা বাবা ভাই বোনেরা নানা ছুতায়, নানা অজুহাতে।

রাত্রে আর তাকে খেতে ডাকতে হয় না।

নরেন যথাসময়ে গিয়ে ছেঁড়া চটের আসন টেনে নিয়ে ভাই বোনদের সঙ্গে খেতে বসে যায়।

তারিণী জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু সুবিধা হল?'

'না।'

'আর কি হয়। কুমুদ কত চেষ্টায় চাকরীটা জুটিয়ে দিয়েছিল। পায়ে ধরতে বাকী রেখেছিলাম শুধু, নইলে কি আর এত ধরাধরি করে জুটিয়ে দিত? সেই চাকরী তুমি খুইয়ে বসলে।'

'আরও তেরজনকে ছাঁটাই করেছে।'

'তের জনকে করুক, তেরশ' জনকে করুক। তুমি কেন চাকরী পেয়ে রাখতে পারবে না, চাকরী খোয়াবে?'

'ইচ্ছে করে খোয়াই নি।'

'ইচ্ছে করলে রাখতে পারতে। আমি তো শুনেছি সব। বাহাদুরী করতে গিয়েছিলে। একবার ভাবলে না চাকরী ছাড়া তোমার গতি নেই। ঝোঁকের মাথায় অবুঝের মত না হয় করেই বসেছিলে বোকামি—ক'মাস যে চুপ করে ছিল ওপরওলারা তার মধ্যে সায়েবের কাছে গিয়ে ঘাট মানতে পারলে না? তা হলে কি তোমার চাকরী যায়!'

এত খিদে পেটে তবু সেঁকা রুটি পাতলা ডাল তিতো লাগে!

'সবাই ষ্ট্রাইক করল—'

'মিছে কথা বোলো না। সবাই ষ্ট্রাইক করলে সব্বায়ের চাকরী যেত। বেছে বেছে তোমাকে খেদালে কেন?'

'আরও তের জনকে খেদিয়েছে।'

'খেদাক। তোমাকে খেদাল কেন? তুমি নিশ্চয় বাহাদুরী করতে গিয়েছিলে?'

নরেন নীরবে খেয়ে যায়।

সংসারে অবিরাম যে কামড়াকামড়ি চলেছে, বিশ্রী কুৎসিত কলহ চালিয়ে যেতে যেতে খানিক আগে তার মা আঠার বছরের মেয়ের গালে যে চড় কসিয়েছে—এটাও সেই ঝগড়া, এ রকম অথবা ও রকম।

কতভাবে কত কিছুর জের টেনে টেনে এবং নতুন অজুহাত আঁকড়ে ধরে যে, অভাবগ্রস্ত নিরুপায় মানুষ আত্মকলহ সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতের আশা ভরসা হারিয়ে গেছে বলেই যেন কারণে অকারণে মারামারি কামড়া কামড়ি করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার বর্তমানকে তিতো করে বিষাক্ত করে বর্জন করে ফেলার ঝোঁক চাপে।

মানুষের মত বাঁচার অধিকার যারা হরণ করেছে তাদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার সুযোগ না পেয়েই যেন আপনজনদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে জ্বালা জুড়োবার চেষ্টার অন্ত নেই।

নরেনও বেকার হয়ে সমান হয়েছে। দুজনে মিলে পয়সা রোজগারের একটা উপায় বার করার জন্য পরামর্শ করতে নরেনের বাড়ীতে গিয়ে নন্দন পড়ে প্রচণ্ড একটা কলহের মধ্যে!

টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে জামাই-এর সঙ্গে এ বাড়ীর মানুষের নগ্ন কুৎসিৎ একটা সংঘাতের মধ্যে।

উমার বড় বোন সন্ধ্যার বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে।

অশোককে জামাই করা হয়েছিল এই সর্তে যে তার এম. এ আর আইন পড়ার খরচটা তারিণী যোগাবে।

এজন্য নগদ টাকা তারা নিয়েছিল সামান্যই।

এম. এ আর আইন পড়ার কি সহজ খরচ! নগদ নিলে যা পাবে, পড়ার খরচের ভারটা শ্বশুরের ঘাড়ে চাপালে লাভ থাকবে তার অনেক বেশী।

কোন এক আত্মীয়ের উদারতায় ঋণ্ করে একটা চাকরী জুটে যাওয়ায় অশোক আর পড়ে নি। পড়ার খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারিণীর কাছে দাবী করা হয়েছিল নগদ টাকা। এই নিয়ে সন্ধ্যার বিয়ের এক বছরের মধ্যে কলহ বেধেছিল।

দুই পক্ষে কিছু রাগারাগির পর মেয়ের মুখ চেয়ে তারিণী নগদ

মত টাকা দাবী করা হয়েছিল তার অর্দ্ধেকের মত দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিল।

অপর পক্ষ সন্তুষ্ট হয় নি, তবে একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই লাভ—এই নীতি অনুসারে আপোষ ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিল।

বোনের বিয়ের টাকার জন্য ঠেকে গিয়ে বিপদে পড়ে এতদিন পরে অশোক আবার এসেছে তার নিজের বিয়েতে প্রাপ্য টাকার ছেড়ে দেওয়া অংশটা আদায় করে নিতে।

জোর দিয়ে সে বলছে, টাকা নাকি সে ছেড়ে দেয় নি, আপোষ করে নি। তারিণীর একলার চাকরীতে সংসার চলছিল, টাকা পয়সা হাতে ছিল না, তাই তখন তারিণী যা দিয়েছিল তাই নিয়ে বাকীটা তার কাছেই গচ্ছিত হিসাবে রেখেছিল, পরে এক সময় নেবে।

শ্বশুরকে খাতির করেই নাকি সে এতদিন তাগিদ দেয় নি, চুপ করে ছিল। টাকাটা জমা আছে থাক, নিলেই তো খরচ হয়ে যাবে, জরুরী দরকার পড়লে তখন চেয়ে নিলেই হবে।

আজ তার দায়ের সময় টাকাটা না দিলে চলবে কেন? বোনের জন্য অনেক চেষ্টায় চাকরে ছেলে পেয়েছে—একেবারে পাকা চাকরী। তারিণীর কাছে টাকা পাওনা থাকতে কয়েক শ' টাকার জন্য এমন ভাল পাত্রের সঙ্গে বোনের বিয়েটা তার ফসকে যাবে?

নন্দন বুঝতে পারে, সংঘাত সুরু হয়েছে অনেক আগেই। কথা কাটাকাটির পর্ব সাঙ্গ হয়ে এখন কলহ উঠেছে চরমে।

নন্দন বাড়ীতে পা দিয়েই শুনতে পায় অশোক চীৎকার করে বলছে, 'দেবেন না মানে? বাপ ব্যাটা দু'জনে মিলে চাকরী করছেন—জামায়ের দেনাটা মিটিয়ে দিতে আপনাদের অসুবিধা কি? নরেনবাবুর চাকরী তো গেছে এই সেদিন—এ্যাদ্দিন তো দু'জনে রোজগার করে টাকা জমিয়েছেন। এরকম অন্যায়

তো চলতে পারে না! ছোটলোক ছাড়া কেউতো এভাবে মেয়ে পার করে জামাইকে ফাঁকি দেয় না!'

নরেন চীৎকার করে বলে, 'তুমি পড়লে না কেন? পড়লে আমরা তোমার পড়ার খরচ দিতাম। তবু আমরা তোমায় পাঁচশ' টাকা নগদ দিয়েছি। আবার নগদ টাকা তোমার কিসের পাওনা?'

'পড়ার খরচ দেবেন বলে নগদ কম নেওয়া হয় নি? নাম মাত্র নেওয়া হয় নি? হিসেব করুন না দু'বছর এম. এ পড়ার খরচ কত—ওটা আমার পাওনা টাকা। আমি এক পয়সা বেশী চাই না।'

একি সেই অশোক? উষাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী এলে যার হাসিখুসী শান্ত অমায়িক স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত? বলত যে এমন জামাই অনেক ভাগ্যে জোটে?

এমন ছোটলোকের মত যে ঝগড়া করছে কয়েক শ' টাকা আদায় করার জন্য—যে টাকা কোন হিসাবেই তার প্রাপ্য নয়! বিয়ের আগে কথাবার্তা চলার সময় এ পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে চাকুরে না হোক, কম পক্ষে ভালভাবে এম. এ. এম এসসি পাশ করা ছেলে তারা খুঁজছে।

মেয়েকে আই, এ পাশ করানোর পর আর পড়াতে পারে নি বটে কিন্তু তারা শিক্ষিত জামাই চায় মেয়ের জন্য। কমপক্ষে এম. এ পাশ।

অশোক যদি এম. এ পড়ে—তাদের খরচে পড়ে—তবেই তারা সন্ধ্যাকে তার হাতে দিতে রাজী হবে।

চাকরী পেয়ে গিয়ে আর না পড়ে সে যে চাকরী করছে এতে কেউ অসুখী নয়—কিন্তু পড়ার জন্যই যে টাকা তার পেছনে ঢালার কথা ছিল, না পড়েও সে টাকা সে দাবী করে কোন যুক্তিতে?

সন্ধ্যা দাঁড়িয়েছিল তফাতে, একা। দু'খানা ঘর আর বারান্দাটাটুকুর সঙ্কীর্ণতায় এতগুলি মানুষ থাকলে যতটুকু তফাতে সরে দাঁড়ানো সম্ভব।

ঝগড়া চলছে এ ঘরের ভিতরে, দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে আছে নরেনের মা আর উষা।

বারান্দার কোনায় সরে গিয়ে সবার দিকে পিছন ফিরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা যেন প্রাণহীনা নিশ্চল মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে নন্দন বলে, 'একটু দরকারে এসেছিলাম, দাঁড়াব না চলে যাব বুঝতে পারছি না।'

সন্ধ্যা তিক্ত কণ্ঠে বলে, 'চলে যাবে কেন? এ তো লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নয়। এদের ব্যবহারটা ছাখো না, সাক্ষী থাকো না। মেয়েকে পার করে এখন জামাইকে ফাঁকি দিচ্ছে, ঝগড়া করছে।'

কি ঝাঁঝ তার কথায়! নন্দন ভাবে, সেরেছে। বাপ-ভায়ের বিরুদ্ধে সন্ধ্যা তবে অশোকের পক্ষে!

নিজে সে কলহে কোন অংশ গ্রহণ করছে না বটে, কলহরত স্বামী আর বাপ-ভায়ের দিকে পিছন ফিরে এখানে রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সমর্থন অশোকের পক্ষে।

এবং কলহ না করলেও সেটা জানিয়ে দিতে সে নিশ্চয় কসুর করে নি। সেইজন্যই এখানে তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।

এরকম ভাবাটা অবশ্য অন্যায় নন্দনের। স্ত্রী স্বামীর পক্ষ না নিয়ে কার পক্ষ নেবে? স্বামীই তো তার সম্বল এখন। কিন্তু নন্দন কিনা ভাবছিল অন্যায়টা সম্পূর্ণরূপে অশোকের, বাস্তব অবস্থা অশোকের দাবীকে কুৎসিৎ হীনতায় পরিণত করলেও যে মিথ্যা করে দেয় নি, এটা তার কিনা খেয়ালেও আসে নি—সে তাই ধরে নিয়েছিল সন্ধ্যা বুঝি অশোকের ছোটলোকামির বিরুদ্ধে গিয়ে বাপ ভায়ের পক্ষ নেবে!

সন্ধ্যার ভাব দেখে এবং কথা শুনে এবার ব্যাপারটা খেয়াল করে তার চমক লেগে যায়।

তাই তো বটে।

সন্ধ্যা যে অশোকের সঙ্গে এসেছে তার সোজা সরল মানেই তো এই যে সে বাপ ভায়ের কাছ থেকে স্বামীর পাওনাটা আদায় করে নিতে স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেই এসেছে।

নইলে সে কি আসত? এ তো সখ বা সুখের বেড়াতে আসা নয় বাপের বাড়ীতে! ঝগড়া করে টাকা আদায় করতে আসা।

মনে প্রাণে অশোকের পক্ষে না থাকলে, দু'জনে মিলে এসে এরকম ঝগড়া করে টাকা আদায়ের পরামর্শ না করে থাকলে—বিষের চেয়ে তিতো এই বাপের বাড়ী আসা সে কি মেনে নিত?

অথবা অশোক তাকে কানে ধরে টেনে এনেছে?

সে ভয়ে এসেছে? অশোকের চাকরীর পয়সায় সারাজীবন তাকে খেতে পরতে হবে জেনে এত বড় ব্যাপারে তাকে চটাবার আতঙ্কের তলে চাপা পড়ে গেছে বাপ-ভায়ের জন্য তার স্বাভাবিক সমর্থন ও সমবেদনা?

কলহে একটু ঢিল পড়েছে বোঝা যায়। চেঁচামেচি কমিয়ে সকলেই একটু ভাববার চেষ্টা করছে, উপায় কি, মীমাংসা কি, এখন কি করা যায়!

নন্দন মৃদুস্বরে বলে, 'তুমি অশোককে একটু বুঝিয়ে বলতে পারলে না সন্ধ্যা? রাগ কোরো না, আমার কোন কথা বলার অধিকার নেই জানি। একদিন ছেলেমানুষী ভালবাসা হয়েছিল বলেই বিয়ের পরেও তোমাকে উপদেশ দেওয়া চলে না।'

সন্ধ্যাও মৃদুস্বরে বলে, 'ওসব কথা থাক না। কী জ্বালায় আছি তুমি বুঝবে কি। একলা মানুষ, চাকরী কর আর সাধ মিটিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াও। থাক্ থাক্, ও সব আমি জানি, আমায় বলতে হবে না,—আমার জন্য বিয়ে করনি বলতে যাচ্ছিলে তো? ওসব ফাঁকির কথার মানে আমি জেনে গিয়েছি।'

'চাকরী করে মাইনে পাবার স্বাদ আজও পাই নি সন্ধ্যা। একটা মাসের জন্যও পাই নি।'

মুখ না ফিরিয়েও কণ্ঠে বিস্ময় ও তিরস্কার ধ্বনিত করে সন্ধ্যা বলে, 'সত্যি? আমার জন্যে নয় তো?'

সন্ধ্যার কথা শুনে মনে মনে নন্দনের হাসি পায়। তাকে পায় নি বলে সে চাকরী পর্যন্ত বর্জন করেছে এ কথাটাব কোন মানে নেই—কথাটা বলার একটা মানে আছে। সংসারের ঝন্‌ঝাটে নিজে সন্ধ্যা পেকে গিয়েছে, তাদের এককালের ভালবাসার ফাঁকি আর ছেলেমানুষী বুঝে গিয়েছে—কিন্তু তাকে সন্ধ্যা ধরে রেখেছে আগের দিনের সেই রকম ছেলেমানুষটি বলে।

তাই সন্ধ্যা বলতে পেরেছে কথাটা—তারই জন্য সে চাকরী করা বাদ দিয়ে সন্ন্যাসী হয় নি তো?

ওদিকে ঝগড়া ঝাঁটিটা আবাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে টের পেয়ে নন্দন স্বস্তি বোধ করে।

এখন মিনিট দশ পনের ওরা খাওয়াখাওয়ি কববে।

সন্ধ্যার সঙ্গে চরম অবোঝা-অবুঝির একটু ফয়সলা করার সুযোগ সে পাবে কিছুক্ষণ। সে যে ছেলেমানুষের মত তাকে ভালবাসেনি, ছেলেমানুষ ছিল বলেই ভালবাসার ছলে খেলায় সন্তুষ্ট থেকেছে, এটা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে নিজেব প্রাণটা তো তার একটু হাল্কা হবে!

ওরা ওদিকে ঝগডা করুক, পবস্পরকে যাবা বাঁচাবে তাবা নিজেদেব মধ্যে ঝগডা করুক—এই ঝগড়ার ভিতর থেকেই বেবিয়ে আসবে আগামী দিনের মিল—আমি বাঁচলে তুমি বাঁচবে, তুমি বাঁচলে আমি বাঁচব, বাঁচাব এই খাঁটি নীতি।

সে বলে 'তোমাব আশ্চর্য্য বোধশক্তি দেখেই তোমায় ভালবেসেছিলাম। তুমি বোধহয় ভাব ভালবাসাটা অনিয়মে ঘটে, এলো মেলো উল্টো পাল্টা যথেচ্ছ নিয়মে ঘটে! এ জগতে ওটা আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি। পেটেব খিদে আব প্রাণের ভালবাসা এক নিয়মে চলে এসেছে।'

'থিয়োরি খাটিও না, দোহাই তোমায়। আগেও তুমি এরকম বড় বড় কথা বলতে।'

নন্দন আহত হয় না। রাগ করে না।

'থিয়োরি নয়, ফাঁকা কথা নয়। পাশ করার জন্য ছেলেবেলা থেকে কি কঠিন তপস্যা করেছি তুমি জানো, পাশ করাটাই আজ পর্য্যন্ত সার হয়ে আছে, আর কিছুই করতে পারলাম না। ছেলেমানুষি ভাবুকতা কি থাকে এ অবস্থায়? জলে পুড়ে সব খাক হয়ে গেছে। কি রকম শক্ত নীরস হয়ে গেছে আমার মন—তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু তোমায় আমি আজও ভালবাসি। পাশের খাতিরে তোমায় হারিয়েছি—নিজের এই বোকামির জন্য আমার আপশোষ মরলেও যাবে না। চোখ মেলে যদি একটু তাকাতাম চারিদিকে, যদি একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম বাস্তবটা কি দাঁড়িয়েছে—মিথ্যা তপস্যায় মেতে না থেকে যদি একটু হিসাব করতাম তোমার জন্য বাঁচার জন্য কিভাবে লড়াই করা উচিত, কোনটা ঠিক পথ! হেরে গেলেও আমার আজ আপশোষ থাকত না। লড়াই না করেই বোকার মত ভুল করে হেরে গেলাম এর চেয়ে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা মানুষের আর কি আছে বলো?'

সন্ধ্যা মুখ ফিরিয়ে তাকায়!

'কষ্ট হয় আমার জন্য?'

'হয়—বিশেষ একরকম ভাবে হয়। তোমার জন্য কষ্টটা অন্য সব কষ্টের সঙ্গে মিশে গেছে। তোমার কথা ভাবলে প্রাণের সমস্ত ব্যথা বেদনা জ্বালা পোড়া এক সঙ্গে নাড়া খায়। কত কাজ করার থাকতে শুধু অকাজ নিয়ে মেতে থেকে জীবনটা নষ্ট করলাম।'

সন্ধ্যা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'ওকথা বলতে নেই। কত যেন বুড়িয়ে গেছ, জীবনটা যেন ফুরিয়ে গেছে।'

নন্দন বলে, 'সমস্ত জীবনটার কথা বলি নি—এতদিন জীবনটা বোকার মত নষ্ট করার কথা বলেছি। বাকী জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়, এবার সেই যুদ্ধ সুরু করব বৈ-কি!'

ঝগড়া চলেছিল সমানে—চড়া গলায়। কে কি বলছে বা বলছে সেদিকে তারা কাণ দেয় নি। হঠাৎ তারিণীর গলা-চেরা আর্তনাদে দুজনে তারা চমকে ওঠে।

আর্তনাদ করে ভগবানের কাছে মরণ প্রার্থনা করতে করতে তারিণী মেঝেতে কপাল ঠুকছে।

সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরে। সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অশোকও যেন ঝিমিয়ে গেছে মনে হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অশোক প্রায় কাতরভাবে বলে, 'সত্যি বলছেন টাকা নেই? উষার বিয়ের জন্যও কিছু জমান নি? তাই থেকে আমায় ধার দিন টাকাটা—আমার দায়টা উদ্ধার হোক। ছ'মাসের মধ্যে আমি যেভাবে পারি টাকা শোধ করব।'

এতক্ষণে যেন স্পষ্ট হয়, মানে খুঁজে পাওয়া যায় অশোকের এরকম মরিয়া হয়ে নাছোড়বান্দার মত টাকা আদায়ের চেষ্টা করার। উষার বিয়ের জন্য টাকা জমানো আছে ধরে নিয়েছে বলেই তার এত রাগ, এত জবরদস্তি।

নইলে নরেনের চাকরী গেছে জেনেও কি এমন জোরের সঙ্গে দুজনে তারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারত!

নরেন মৃদুস্বরে বলে, 'উষার বিয়ের জন্য জমানো টাকা? সন্ধ্যার বিয়ের দেনা কত বাকী আছে জিজ্ঞেস করো বরং।'

পরদিন সকালে সে মাধবের বাড়ী যায়।

পাঁচখানা বই খুলে সামনে সাজিয়ে রেখে মাধব একখণ্ড আলগা কাগজে কি সব নোট করছিল।

ঠিক যেন মুক্তি পেয়ে খুসী হয়ে সে বলে, 'আসুন, বসুন।'

গলা সামান্য একটু চড়িয়ে বলে, 'দু' কাপ চা দিও।'

তার পর বলে, 'মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে?'

'শুনে যাস্ কেন চাকরী নেই ?'

'সে রকম শুকনো নয়। মনে হচ্ছে যেন বড়ই মনোকষ্টে আছেন।'

'চাকরী নেই, মনোকষ্টে থাকবেন না ?'

কথাটা বলে মানসী।

যেন নরেনের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে।

সে চা নিয়ে আসে নি। জানায় যে চায়ের জল চাপিয়ে এসেছে।

মাধব বলে, 'তুমি বুঝলে না আমার কথাটা।'

'বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।'

মাধব একটু ভাবে। একবার নরেনের দিকে একবার মানসীর দিকে তাকায়। তারপর ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি বলছিলাম মুখের ভাবের কথা। মুখের ভাবেরও তো রকমারি আছে ? রোগ হলে এক রকম, রাগ হলে এক রকম, মনে কষ্ট হলে এক রকম—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। চাকরী না থাকলে কি রকম মুখের ভাব হয় বল তো, শুনে রাখি, শিখে রাখি ?'

মাধব হাসে। খুব যেন খুসী হয়েছে মানসীর কথা শুনে। সানন্দে একটা সিগারেট ধরায়।

বলে, 'জ্ঞান বিজ্ঞান কোথায় পৌঁচেছে জান না, তাই ভাব আমি বুঝি এলোমেলো বকছি। এ্যাটম বোমা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে মানুষের হাতে ? অনেক কষ্ট অনেক চেষ্টায় মানুষ আবিষ্কার করেছে এ্যাটম বোমা। লক্ষণ দেখে, কারণ দেখে, সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে পেরে, তবে আবিষ্কার করেছে। মনের ভাবের ছাপ মানুষের মুখে পড়বে এ তো মোটা কথা।'

মানসী যেন নিজে তর্ক করে, নরেনের সঙ্গে মাধবের তর্ক ঠেকিয়ে রাখবে, পণ করে ঘরে এসেছে। মাধবের কোন কথাই সে এখন মানবে না, সব কথার প্রতিবাদ করে তর্ক চালিয়ে যাবে।

সে গম্ভীর হয়েই বলে, 'মুখের ভাব দেখে বলতে পারবে আমার খিদে পেয়েছে না পেটের অসুখ হয়েছে?'

মাধব অনায়াসে বলে, 'শুধু মুখের ভাব কেন? তোমার মুখের ভাব দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তোমার চালচলন কথাবার্তায় সেটার প্রমাণ পাচ্ছি।'

'কি হয়েছে আমার?'

'রাগের চোটে তোমার মাথা ধরেছে, গা বমি বমি করছে।'

'খুব বলেছ। এই তুমি সব-জান্তা পণ্ডিত? আমার বলে ঘুম হয় না, অর্দ্ধেক রাত ছটফট করি—'

মাধব একটু হেসে বলে, 'ওটা তোমার রাগেরই আরেকটা লক্ষণ। রাগের জন্য এখন তোমার মাথা ধরে আছে, গা বমি বমি করছে—রাগের জন্যই রাত্রে ঘুম আসবে না।'

মানসী যেন একটু চটে যায়।

'রাগের আবার কি দেখলে তুমি? কখন আবার আমি রাগারাগি করলাম তোমার সঙ্গে?'

মাধব সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'করলে না বলেই তো এরকম হয়েছে! রাগটা কদিন ভেতরে চেপে রেখেছ, দেখাচ্ছ যে রাগ তোমার হয় নি। রাগারাগি করলে তো ফুরিয়েই যেত—রাত্রেও ঘুমোতে, মাথাও ধরত না, গা বমি বমিও করত না।'

মানসী হাল্কা সুরে বলবার চেষ্টা করে, 'কি বলছ পাগলের মত? এর মধ্যে নতুন করে রাগের কি কারণ ঘটেছে? বিনা কারণে রাগব কেন? রাগ হলে আমি কখনো চেপে রাখি!'

'মাঝে মাঝে চেপে রাখো বৈ-কি!'

'কখ্‌খনো না!'

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি এখন আসি। একটু দরকার ছিল—'

মানসী ফোঁস করে ওঠে, 'না, উঠবেন না। এতক্ষণ শুনলেন, বাকীটা শুনে

তবে যাবেন। কেমন বানিয়ে বানিয়ে প্যাচানো কথা বলে আমায় জব্দ করে একটা প্রমান নিয়ে যান।'

মাধবের দিকে চেয়ে বলে, 'আমি রাগ করেছি, আমিই জানি না কেন রাগ করেছি? অবচেতনার রাগ নাকি আমার?'

মাধব বলে, 'না, এমনি রাগ। রাগ যে হয়েছে তাও তুমি জানো, কেন রেগেছ তাও জানো। রাগটা চেপে যাবার চেষ্টা করছ। একটুও রাগ যেথাও নি কিনা তাই ভেবেছ আমি টের পাব না রেগেছ, কেন রেগেছ।'

মানসী আবার ফোঁস করে ওঠে, 'ছলনা করছি?'

মাধব বলে, 'করছ বৈ-কি! তবে তোমার উদ্দেশ্যটা ভাল।'

মানসী চেঁচিয়ে বলে, 'বলো কেন রেগেছি। তোমায় বলতে হবে।'

মাধব একটু চুপ করে থাকে।

'মানসী আরও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, বলো। না বললে চলবে না। সব বিষয়ে তোমার বাহাদুরী।'

মাধব ধীরে ধীরে বলে, 'বলতে আপত্তি কি? দিল্লীর চাকরীটা নিই নি বলে তুমি রেগেছ।'

'তুমি কোন্ চাকরী নেবে না নেবে—'

'তাতে তোমার কিছু আসে যায় না? এ কি একটা কথা হল মনু! তোমার খুব ইচ্ছা ছিল অফারটা নিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে যখন পরামর্শ করছিলাম, এ চাকরী কেন আমার পোষাবে না বোঝাচ্ছিলাম, মনের ইচ্ছাটা তুমি চাপতে পার নি। তবে জোর করে তুমি বলনি—চাকরীটা নিতেই হবে। তুমি তো জানো বলে লাভ নেই, টাকার জন্য আমি আদর্শ ছাড়ব না, নিজেকে বিক্রী করব না।'

'আমি কোনদিন বলেছি আদর্শ ছাড়তে, নিজেকে বিক্রী করতে?'

'সোজাসুজি তা বলনি। কিন্তু এমন অনেক কিছু আমাকে করতে বলেছ যার মানেই দাঁড়ায়—'

'ওই যাঃ কখন উনুনে কেটলি চাপিয়ে এসেছি!'

মানসী যেন পালিয়ে যায়।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, 'আপনি একটা ভুল করলেন। আমার সামনে এভাবে ওঁকে জব্দ করা উচিত হল না।'

মাধব বলে, 'আপনি ভুল বুঝলেন। কথাটা ও তুলেছিল আপনার সামনে আমাকে জব্দ করতে। আমি ওর ভুল-ধারণাটা সংশোধন করে দিলাম। ও ভেবেছে মনের মধ্যে চেপে রাখলেই বুঝি মনের বড় বড় কথা আমার কাছে গোপন করা যায়। এখনো বুঝতে পারে নি যে আমার এটা বাহাদুরী নয়, পাণ্ডিত্য নয়। এর মধ্যে ম্যাজিক কিছুই নেই। এক সঙ্গে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া ওঠা বসা ঘুমানো থেকে সব কিছু চলছে ক'বছর ধরে—কারও পক্ষে অন্যের কাছে কিছু গোপন রাখা সম্ভব? মিল আর অমিল সব ধরা পড়ে যাবেই। মানে বুঝতে না পারা আলাদা কথা, কেন এ রকম হল কেন ও রকম হল না বুঝলে আসে যায় না। আসে যায় না মানে, আমাদের পক্ষে আসে যায় না।'

মানসী যেন তার কথার জবাব দেবার জন্যই তৈরী চা নিয়ে ঘরে আসে—চা দেবার জন্য নয়। কারণ, কাপে চা ঢেলে দেবার চেষ্টামাত্র না করে সে বলে, 'মিছে আমার বদনাম দিচ্ছ। একি অন্যায় কথা বল তো? তুমি মস্ত বিদ্বান বলেই যা খুসী বলবে তাই ঠিক ধরে নিতে হবে? তুমি উল্টো বুঝেছ। দিল্লীর চাকরী নাও নি বলে রাগ করব? চাকরীটা নিতে চাইলেই বরং আমি বারণ করতাম, নিলে রাগ করতাম। কেন জানো?'

'চা-টা দিয়েই বল না?'

মানসী নীরবে কাপে চা ঢেলে দেয়—নিখুঁতভাবে, লালিত্যপূর্ণ ভাবে।

বলে, 'আমায় তুমি খুব বোকা ভাব। বেশ আমি বোকা। আমায় তুমি স্বার্থপর ভাব। বেশ আমি স্বার্থপর। স্বার্থপর নিজের স্বার্থ দেখবে তো? স্বার্থের হিসাবটা ভাল বুঝবে তো? দিল্লীর চাকরী তোমায় আমি নিতে দিতাম না—

ক'মাস বাদে চাকরী খুইয়ে এই ভদ্রলোকের মত বেকার হবে বলে। তোমার ধাত আমি জানি। তোমার থিয়োরি অনুসারেই জানি—এইমাত্র তুমি এঁকে বলছিলে যে বোঝাপড়া থাক বা না থাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে কেমন মানুষ অজানা থাকে না।) আমি জানি ও চাকরীটা নিলেও তুমি বেশীদিন চালাতে পারতে না—তোমার ধাতেই বরদাস্ত হত না। নিজের স্বার্থেই আমি তাই তোমায় চাকরীটা নিতে দিতাম না।'

মাধব ধীরে ধীরে বলে, 'পারলে না। আমিও এই কথাই বলেছি। চাকরীটা নিলাম না বলেই তোমার রাগ—রাগটা তুমি চেপে গেছ আমার ধাত জানো বলে। তুমি জানো বৈকি যে রাগ দেখিয়ে চাকরীটা নেওয়ালেও লাভ নেই—বেশীদিন আমি চালাতে পারব না। আমার এই ধাতটা মেনে নিতে হচ্ছে বলেই তোমার রাগ।'

মানসী চুপ করে থাকে।

বরাবর যেভাবে তর্কে হেরে চুপ করে যায়।

এবার নরেন দারুন অস্বস্তি বোধ করে।

তার সামনে এতক্ষণ দু'জনের কলহ চালানোর মধ্যে এমন একটা নাটকীয় অবাস্তবতা ছিল, এমন একটা অসাধারণতা ছিল, (ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে দাম্পত্য কলহকে বুদ্ধির লড়াই করে রাখার এমন একটা চেষ্টা ছিল যে দু'জনের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ঝাঁঝ পেয়েও নরেন তেমন বিচলিত হয় নি।)

হার মেনে মানসী চুপ করে যাওয়া মাত্র যেন বাস্তব হয়ে গেল দু'জনের কলহ—স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সত্যটা যে বুদ্ধির লড়াই থেমে গেছে, আসল লড়াই আরম্ভ হচ্ছে না কেবল তার জন্য। সে বিদায় নেবার পরেই ওদের মধ্যে সুরু হয়ে যাবে পরস্পরের প্রতি কদর্য্য নিষ্ঠুর আক্রমণ।

দু'জনেই সামরিকভাবে ঘায়েল হয়ে যাবে সে লড়ায়ে!

সে উঠে দাঁড়ায়।

প্রায় কাতরভাবে আতঙ্কের সঙ্গে মানসী বলে, 'আরেকটু বসুন না ?'

মাধবও অনুরোধ জানায়, 'বসেই যান না খানিকক্ষণ। বেকার মানুষ, ঘুরে বেড়িয়ে কি করবেন ?'

দু'জনেই চায় সে আরও কিছুক্ষণ বসুক। পিছিয়ে যাক তাদের কামড়াকামড়ি, গায়ের জ্বালার উত্তাপ খানিকটা উপে যাক, মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা হোক, মেজাজ খানিকটা নরম হোক।

অগত্যা সে বসে।

মাধব একটা সিগার বাড়িয়ে দিলে অগত্যা সেটা ধরায়।

ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গিয়েছিল মানসীর কাপের চা।

একচুমুকে সরবতের মত নিজের চা-টা খেয়ে মানসী বলে, 'এত লোকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা—ওঁকে একটা চাকরী দিতে পার না ?'

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে কিছু না বলেই গট গট করে বেরিয়ে যায়।

৪

না। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয় না।

মেঘ না হলে বজ্র পড়ে না।

দেড়দিন.বন্ধ থাকার পর সেদিন দোকান খুলবে। সকালে যথারীতি কাজে গিয়ে দোকানের নিজস্ব তালার উপর অন্য লোকের লটকানো দেখে প্রায় অশিক্ষিত দীননাথের মনে হয় না, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে।

ছাঁটাই হবে নরেন যেমন ভেবেছিল।

সকাল থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা পর্য্যন্ত দোকানে তার সময় কাটে দোকানের কাজে, ভেতরের ব্যাপার সব না জানলেও খানিকটা সে আঁচ করেছিল বৈ-কি।

গোবিন্দের ভাবসাব, চালচলন দেখে তারও আশঙ্কা হয়েছিল বৈ-কি যে এরকম একটা কিছু ঘটবে।

দোকানের সামনে দীননাথ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু গোবিন্দ বা তার বাড়ীর কেউ দোকানে আসে না। একটা লরীতে কয়েকজন লোক নিয়ে হাজির হয় ভুবন।

বলে, 'কি খবর দীননাথ?'

'আজ্ঞে খবর আর কি, দোকানে কারা তালা এঁটে দিয়েছে দেখছি।'

ভুবন নতুন তালা খুলতে খুলতে হেসে বলে, 'আমরাই দিয়েছি। আমাদের বেচে দিয়েছে দোকানটা।

দীননাথ যন্ত্রের মত বলে 'বেচে দিয়েছে?'

নতুন তালা চাবি দিয়ে খোলার পর পুরাণো তালা ভাঙ্গার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভুবন লোক সঙ্গে করেই এনেছিল।

দীননাথ বলে, 'আজ্ঞে চাবিটা আনিয়ে নিলে হত না?'

ভুবন বলে, 'আর বলো কেন গোবিন্দ ছোঁড়াটার কথা—এক নম্বর সয়তান। দোকানের চাবি পকেটে নিয়ে বজ্জাতটা কোথায় সটকেছে—কাল সকাল থেকে পাত্তা নেই। কাগজপত্র সই করে বুড়ো বলল, গোবিন্দ বাড়ী ফিরলেই চাবি পাঠিয়ে দেবে। সকালে লোক পাঠালাম—ছোঁড়া এখনও ফেরে নি।'

দোকান বেচে দিয়েছে গোবিন্দেরা, দোকানের নূতন মালিক হয়েছে। কিন্তু দোকানটা আছে। সে এতকাল কাজ করছে দোকানে, তার কাজটাও নিশ্চয় বজায় থাকবে।

কিন্তু লরী কেন? লরীতে মাল তুলবার কুলিরা সঙ্গে কেন?

ভরসা করে মুখ ফুটে ভুবনকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তালা ভেঙ্গে দোকান খুলে দোকানের মাল লরীতে তোলা আরম্ভ হলে সে আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'দোকানটা চালাবেন না, আজ্ঞে ?'

'নাঃ—আমা কাপড়ের এইটুকু দোকান চালিয়ে কি লাভ ? মালপত্র বড দোকানে চালান করে দিচ্ছি। এ দোকানে শুধু উল থাকবে।'

'মোর কাজটা থাকবে তো, আজ্ঞে ?'

'তোমার কাজ ?'

ভুবন তার মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। দীননাথ তাড়াতাড়ি বলে, 'উলের দোকানে নাই যদি হয়, কা ড়ের দোকানে একটা কাজ দেবেন তো মোকে ? কাজ গেলে খাব কি !'

ভুবন দু'বার মাথা হেলিয়ে তার কথায় সায় দেয়, স্বীকার করে নেয় তার কাজ থাকার প্রয়োজনটা। ধীরে ধীরে বলে, 'ত্যাখো, তুমি বুড়ো মানুষ, গরীব মানুষ। মিথ্যে আশা দিয়ে তোমায় আমি ভোগাব না। কাপড়ের দোকানে লোকের দরকার নেই—একজনাকে বরং ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছি। উল বেচার কাজ তুমি পারবে না।'

দীননাথ মূঢ়ের মত চোর চেয়ে থাকে।

'তোমার পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দেব—আজকেই দেব।'

কী উদারতা ! দীননাথ একটা নিশ্বাস চেপে যায়।

এক মাস মোটে বাকী ছেলের পরীক্ষার।

দোকান উঠে যাবার খবরটা দীননাথ একেবারে চেপে যায়।

নন্দনের বাড়ী থেকে জেনে এসে নরেন পাছে কিছু বলে বসে এই ভয়ে সে তাকেও সাবধান করে দেয়, 'বাড়ীতে বোলো না কিন্তু বাবা। কিছু যাতে জানতে না পারে—মন বিগড়ে যাবে ছেলেটার। পরীক্ষা তক্ চুপচাপ কাটিয়ে দেব ভাবছি। রোজ ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাব।'

নরেন তখন পর্য্যন্ত খবর জানত না, সে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কি, বলব না বাড়ীতে ?'

দীননাথের কাছে খবর জেনেই সে নন্দনদের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

নন্দন প্রথম কথাই বলে, 'দু'বেলা দুটো পোড়াভাত জুটছিল, এবার তাও বন্ধ হবে। এতদিন দোষ দেওয়া যেত, এবার কিছু বলতেও পারব না।'

নরেন বলে, 'কি করে গেল দোকানটা ?'

'দেনায় বিক্রী হয়ে গেল। জেঠার যেমন বুদ্ধি—গোবিন্দের মত ভদ্র বাবুকে দিলে দোকান চালাতে। দোকান বড় করবে, ফাঁপিয়ে তুলবে, লাখপতি হবে! ছোট একটা দোকান চালাতে না শিখেই বড় বাজারের সঙ্গে পাল্লা দেবে!'

'কিছুই বাঁচে নি ?'

'কে জানে! আমায় কি ভেতরের কথা কিছু জানায় ? অল্পবিস্তর কিছু নিশ্চয় পাওয়া গেছে।'

নরেন ভেতরে গিয়ে প্রথমেই ছবিরাণীর মুখের দিকে তাকায়।

এবারও মুখখানা তার একটু কাঁদ কাঁদ দেখাবে না ? অন্তত একটু ম্লান দেখাবে না ?

ছবিরাণীর চেনা মুখে অচেনা দুঃখ বেদনার কোন ছাপ না দেখে সে সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

তারপর ভাবে, না, এত তাড়াতাড়ি তার মুখ কাঁদ কাঁদ হবার তো কথা নয়! সংসার চালাবার উপায়টা হাত ছাড়া হয়ে গেছে এটা তার কাছে শুধু বড়দের দুর্ভাগ্যের কথা, একটা দুর্ঘটনা।

অন্য ব্যবস্থা একটা ওরাই আবার করবে নিশ্চয়! এ ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার ?

মুখ সে ম্লান করতে যাবে কি জন্য ?

গৌরী বলে, 'আমাদের তো সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবা।'

'শুনলাম সব।'

গোবিন্দ শুকনো ম্লানমুখে বলে, 'বাহাদুরি করতে গিয়ে একেবারে ডুবিয়ে দিলাম সংসারটাকে।'

নরেন তাকে যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ভুলচুক হয়ে যায় মানুষের—তুমি তো আর বদখেয়ালে দোকানটা নষ্ট কর নি, ভালই করতে চেয়েছিলে।'

'তফাৎটা কি হল? বদখেয়ালে নষ্ট করলে যা হত, এতেও তাই দাঁড়াচ্ছে। বোকামিও বদখেয়াল বৈ-কি।'

নরেন মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, 'না, বদখেয়ালে দোকান নষ্ট হলে তোমার কোন শিক্ষাই হত না—কিন্তু এতে তোমার অভিজ্ঞতা জন্মাল। আস্তে আস্তে তুমিই আবার গড়ে তুলবে।'

গৌরী আপশোষের সঙ্গে বলে, 'আর গড়ে তুলেছে! কি দিয়ে গড়বে? সব জলে দিয়ে এল।'

নরেন বলে, 'যা বেঁচেছে—'

গোবিন্দ বলে, 'পানবিড়ির দোকান দেওয়া যেতে পারে।'

'তাই নয় দেবে। নয় অন্য কিছু করবে।'

হেমেন্দ্র ঘরের ভিতর থেকে তাদের কথা শুনছিল, এবার ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'যা অবস্থা দেখছি চারিদিকে, আশা-ভরসা নেই আর। চাকরী বাকরী একটা করবে এ আশাটুকু যে করব তাও তো নিজের ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। আজ পর্যন্ত নন্দনটার একটা হিল্লে হল না। বুড়ো বয়সে কত দুঃখ আছে আমার পোড়া কপালে।'

বলতে বলতে হেমেন্দ্র আবার ঘরে চলে যায়। গৌরী যায় সব সংসারের কাজে। গোবিন্দ মুখ ভার করে অন্য দিকে চেয়ে বসে থাকে।

ছবিরাণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্য নরেন অনেকক্ষণ এ বাড়ীতে কাটিয়ে দেয়। বৈঠকখানায় একা বসে থাকে মিনিট দশেক। কিন্তু ছবিরাণী গা না করায় কথা বলার সুযোগটা আর ঘটে ওঠে না।

এতক্ষণ খেয়াল করে নি, ক্রমে ক্রমে নরেনের খটকা লাগে যে এ বাড়ীর মানুষগুলি তো আগের মত ব্যবহার করছে না তার সঙ্গে। নন্দনের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই এরা করুক, নন্দনের বন্ধু বলে তাকে কোনদিন অবহেলার ভাব কেউ

দেখায় নি। সেটা বোধ হয় এদের হিসাবেই আসত না। সোজাসুজি অবজ্ঞার ভাব না দেখিয়েও আজ যেন এরা বেশ একটু অগ্রাহ্য করে চলছে তার উপস্থিতিকে।

এদের মন খারাপ বলে?

অথবা তার চাকরী নেই বলে?

কিন্তু দোকানটা গেছে বলে যতই মন খারাপ হোক তাকে তুচ্ছ করার মনোভাবে তো সেটা প্রকাশ হওয়ার কথা নয়।

এ তো ঠিক ম্লান মুখে চুপ করে থাকা নয়!

অগত্যা বিদায় নিয়ে গৌরীর সামনে নরেন ছবিরাণীকে বলে, 'তুমি যে আর আমাদের বাড়ী যাও না ছবি? উষা তোমার কথা বলছিল।'

'যাব। উষিকে আসতে বোলো।'

কি ভেবে ছবিরাণী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে, 'আচ্ছা, আমিই যাব আজকে দুপুরবেলা। ঠিক যাব।'

দুপুরবেলা ছবিরাণী যে আসবে বলেছে এ কথা সে ইচ্ছা করেই উষাকে কিছু জানায় না।

দুপুরবেলা উষা কাছেই এক বাড়ীতে তার সখি তমালের কাছে যায়।

পাড়ার আরও তিন চারটি বয়স্কা কুমারী মেয়েও গিয়ে জোটে—যে যতক্ষণের জন্য পারে। তমালের ঘরে বসে তারা গল্প করে, মেয়েলি আড্ডা বসায়।

বাড়ীতে পুরুষ বলতে তমালের বাবা প্রভাত একা, দুপুরে সে থাকে আপিসে। সময় থাকলে দুপুরবেলা মেয়েদের ও বাড়ীতে যেতে আসতে তাই কোন বাড়ীতে আপত্তি করা হয় না।

ছবিরাণী যখন আসে প্রতিদিনের মত উষা আড্ডা জমাতে গেছে, মা ওঘরে ঘুমিয়ে আছে।

নরেন বলে, 'আমি জানি তুমি কি বলবে।'

'তুমি জানতেই পার না। একেবারে অসম্ভব জানা তোমার পক্ষে।'

'জানি। তুমি বলতে এসেছ যে তাড়াতাড়ি তোমায় বিয়ে দিয়ে পার করার চেষ্টা চলছে—এখন আমি কি বলি।'

ছবিরাণী আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'বড়দার কাছে শুনেছ? কিন্তু বড়দার তো জানবার কথা নয় এখনো! শুধু মা আর দাদুর মধ্যে গোপনে পরামর্শ হয়েছে।'

নরেন হেসে বলে, 'গোপনে পরামর্শ হয়ে থাকলে তুমি জানলে কি করে? তোমাদের বাড়ীতে কারো গোপনে কিছু বলাবলি করার যো নেই, না? সে দিন তুমি আড়াল থেকে নন্দন আর আমার সব কথা শুনেছিলে!'

ছবিরাণীও হাসে।

'শুনেছিলাম তো! আমি কৌতূহল চাপতে পারি না কি করব? কিন্তু তুমি কি করে জানলে বল না?

'অনুমান করলাম। সংসারের এই তো রীতি। দোকানটা গেল মানেই সামনে দুরবস্থা, আর হয় তো পারাই যাবে না তোমাকে পার করতে। তার চেয়ে নগদ আর গয়নাগাটিগুলি বজায় থাকতে থাকতে চোখ কান বুজে তোমাকে পার করে দিতে পারলেই চুকে গেল। তারপর কপালে যা থাকে হবে।'

'আশ্চয্য তো! মা আর দাদু ঠিক এই কথাগুলি বলাবলি করছিল! তোমার সাংসারিক বুদ্ধি তো ভারি টনটনে!'

'টনটনে বুদ্ধি দরকার হয় না। এ অবস্থায় আর পাঁচজনে যা করত তোমার মা আর দাদুও তাই করছে। তুমিই হলে একমাত্র দায় যা ঘাড় থেকে নামানো চলে। অন্য দায় ঘাড়ে থাকবেই—খাওয়াপরা জুটুক আর নাই জুটুক।'

ছবিরাণী বলে, 'ভাবলেও রাগ হয়, কিন্তু রাগ করব না। একটা কথা কিন্তু তুমি বলতে পার নি, পারবেও না। আচ্ছা, আরেকটু জানিয়ে দিই, দেখি বলতে পার কি না। শুধু আলগা পরামর্শ হয় নি, ব্যবস্থার কথাও হয়েছে। একটি পাত্র আছেন, খুব কম মাইনে হলেও চাকরী করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল না হলেও একরকম চলে যায়। বোধ হয় চাহিদাও বেশী হবে না। কাজেই বুঝতে পারছ ব্যাপার? হয় তো এই ফাগুনেই দাদু সব চুকিয়ে দেবে।'

ছবিরাণী একটু হাসে। সত্যই হাসে। বলে, 'এবার ঠিক করে বলতো আমি কেন এসেছি।'

'পরামর্শ করতে। আমাকে সব জানিয়ে সাবধান করে দিতে যে, সময় থাকতে ব্যবস্থা কর।'

'সাবধান করে দিতে এসেছি ঠিক, কিন্তু পরামর্শ করতে আসি নি। আমি কি ঠিক করেছি জানিয়ে দিতে এসেছি।'

নরেন আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, 'কি করবে ঠিক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। ঠিক করেছি বাধা দেব না।'

নরেনের মুখের ভাব দেখে ছবিরাণীর মুখ এবার গম্ভীর হয়, উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন একটু ম্লানও দেখায়।

বলে, 'অবশ্য তুমি যদি কিছু না কর। তুমি যদি এর মধ্যে চাকরী-চাকরী জুটিয়ে নিতে পার তা হলে তো কথাই নেই—ওখানে কেউ আমাকে ঠেলে দিতে পারবে না। ঠেলে দিতে চাইবেও না। 'কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে কিছু করতে না পারলেও তুমি যদি জোর দিয়ে বলতে পার যে দু'তিন মাসের মধ্যে একটা কিছু যোগাড় করে নিতে পারবে, আমি যে করে পারি এটা পিছিয়ে দেব।'

নরেন কথা বলে না। নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে। (সে চাউনিতে যে কতরকম ভাব মেশানো!)

'কিছু বলছ না যে?'

'কি বলব? আমার কিছু বলার নেই। আমার বলার অপেক্ষা না করেই তুমি তো মন স্থির করেই ফেলেছ।'

এবার ছবিরাণীর মুখে নেমে আসে একটা থম থমে ভাব।

সে ধীরে ধীরে বলে, 'ছাখো, আমি প্রাণ খুলে আমার কথাটা তোমায় বোঝাতে এসেছি। না বুঝে কিছু ধরে নিও না, রাগ কোরো না। রাগ অভিমান পরে হবে,

আগে বোঝাবুঝিটা হোক। আমি কি এটা চাই? ভাবলেও আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে না? কিন্তু জানি তো ইচ্ছা করলেই সত্যি সত্যি মরতে পারব না, খেয়ে পরে বেঁচে থাকতেই হবে।'

'অমন করে বাঁচার চেয়ে—'

'ওসব কথা বোলো না। আমি ওসব বড বড় কথা জানিও না, বুঝিও না। আমি বাবা একেলে মেয়ে—দেখছি তো সংসারের অবস্থা। (উড়ো কথায় চিডে ভেজে না জানি। একদিন তোমার চাকরী হবেই যদি ভরসা থাকত, মা আর দাদুর সঙ্গে লড়াই করে আমি এটা ঠেকাতাম।'

'কোন দিন চাকরী হবে না আমার?'

'একটা চাকরীই বডদার হয় না, তোমাব পাওয়া চাকরীটা গেল। আবার কি ভরসা আছে? এটা যদি ঠেকাই, আমার কি অবস্থা হবে বুঝে ত্তাখো। মা আর দাদার ঘাডে পডে থেকে লাথি ঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটবে।'

আরও বেশী আহত বা আশ্চর্য্য হবার ক্ষমতা নরেনেব ছিল না। ছবিরাণীরও অবিকল তার বাড়ীব লোকের হিসাব—চাকরী পেযে তার চাকরী গেছে, তার দ্বারা আর কিছু হবে না!

একটু ঝাঁঝাঁলো হাসির সঙ্গে সে বলে, 'তবে এটাই লেগে যাক্। চাকরে বব পাচ্ছ, ছাড়বে কেন?'

'এটা তো রাগে কথা বললে।'

'রাগ হয়েছে বলব না? অন্য কথা বলে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না।'

'বোঝাবার চেষ্টা কর না? কি বলতে চাও বলো, দেখি বুঝতে পারি কি না?

নরেন বলে, 'তুমি ধরে নিয়েছ নন্দনের কপালে চাকরী জোটার সামান্য একটু আশা যদিই বা থাকে, আমার বেলা আর কোন আশা নেই। আমার চান্স আমি পেয়ে গেছি, আর পাব না।'

ছবিরাণী শান্ত মুখে চেয়ে থাকে।

'কত লোকের কাজ নেই জানো?'

'অনেক লোকের নেই।'

'কত লোকের চাকরী গেছে জানো?'

'অনেক লোকের গেছে।'

'সারা জন্মে এরা আর চাকরী পাবে না? এই অবস্থা চিরদিন বজায় থাকবে? তোমার ঘটে এটুকু বুদ্ধি নেই যে বুঝতে পার, এরকম ভয়ানক অবস্থা বেশী দিন আর চলতে পারে না? এ অবস্থা পাল্টে যাবেই?'

'কি করে যাবে? কে পাল্টাবে?'

'আমরা পাল্টাব, যারা কাজ করতে চেয়ে কাজ পাই না। দেশের লোকে পাল্টাবে, যারা দেশকে ভালবাসে। এ অবস্থা যারা কোনমতে মানবে না সইবে না।

ছবিরাণী একটু রাগে।

'ঘরের কোনে থাকি বলে কি ভেবেছ এসব কথা কানে আসে না? পেটে বেশী বিদ্যে নেই বলে, মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজটাও পড়ি না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে কথাবার্তা শুনে!'

ছবিরাণী আরও রেগে বলে, 'রাগ কর আর টিটকারী দাও, আমি সব জানি। তোমাদের নিজেদের দোষেই কোনদিন তোমাদের চাকরী হবে না। চাকরী নেই বলে তোমরা হাঙ্গামা জুড়েছ, চাকরীর ব্যবস্থা করতে দিচ্ছ না।'

নরেন হেসে বলে, 'কই, আমি তো কখনো কোন হাঙ্গামা করি নি! নিরীহ গোবেচারীর মত আপিসের দরজায় দরজায় চাকরী ভিক্ষে চেয়ে ফিরছি।'

ছবিরাণী এতটুকু দমে না।

'এ পর্যন্ত করনি, কাল তুমিও হাঙ্গামা করবে। যে ঝাঁঝ তোমার কথায়! মনে রেখো, অন্যেরা হাঙ্গামা করছে বলে তোমারও চাকরী হচ্ছে না।'

নরেন একটু হেসে বলে, 'কিম্বা হাঙ্গামা না করে চুপচাপ সব সয়ে এসেছি বলেই আমার এই দশা?'

কে জানে ছবিরাণী কি জবাব দিত তার এ কথার, ওঘর থেকে মার প্রশ্ন আসে, ‘কার সঙ্গে কথা বলছিস্ নরেন ?’

‘ছবি এসেছে।’

‘এ ঘরে পাঠিয়ে দে। উধাটার রোজ দুপুরে বেরোনো চাই, বললেও শুনবে না। মরণ নেই আমার !’

ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ছবিরাণী নরেনকে মুখ খুলতে নিষেধ করে।

‘আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম মাসীমা—’

বলতে বলতে সে ওঘরে যায়।

৫

জীবনটার মানে তা হলে কি দাঁড়াল ?

আপ-জন বাতিল করেছে।

যোয়ান বেকারকে মানা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুরা বাতিল করেছে ।

বেকার বন্ধু কথায় কথায় চটে যায়, অপমানিত হয়, কথাবার্তায় রসকস রাখতে পারে না। আবার টাকাও ধার চায় !

ছবিরাণী মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, যে কোনদিন চাকরী বাকরী তার আর জুটবে না, হাসিখুসি ছবিরাণীও অগত্যা মুখের হাসি মুছে ফেলে তাকে বাতিল করেছে !

তাকে বাতিল না করে ছবিরাণীরও উপায় নেই।

আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে এভাবে বাতিল হয়ে, ছবিরাণীর কাছে বাতিল হয়ে নরেন যেন একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া স্বস্তি বোধ করে।

এরা বাতিল করেছে—আর এদের খাতিরে মান সম্মান মনুষ্যত্ব বাতিল করে চাকরীর জন্য কর্তাব্যক্তিদের গেটে গেটে দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দেওয়ার তার দরকার হবে না।

নিজেকে বাজে তুচ্ছ অমানুষ মনে করার প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে।

সে কারও ধার ধারে না।

ইচ্ছা করলে গায়ের জ্বালায় যে অপিস থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে আপিসে আগুণ ধরিয়ে দিতে গিয়ে সে জেলে যেতে পারে।

কেউ বলতে পারবে না যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে সে ঝোঁকের মাথায় নিজের খেয়াল খুসীতে জেলে গেলো!

ছাঁটাই হয়েছে। বিনা নোটিশে বেকার হয়েছে।

কিন্তু এদিক দিয়ে সে যেন স্বাধীনও হয়েছে।

ইচ্ছা হলেই সে যে কোন মিটিং-এ গিয়ে চাকরী দেওয়াব মালকদের বিরুদ্ধে জোর গলায় জেহাদ ঘোষণা করতে পারে। তার মত যারা কাজ চায় খাটতে চায় সামান্য মজুরিব জন্য, অথচ কাজ পায় না খাটতে পায় না—তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেও বলতে পারে, চুলোয় যাক। চুলোয় যাক এসব লোক আর এসব লোকের অনিয়ম অব্যবস্থা।

ছবিরাণী যেন শেষ করে দিয়েছে সহের যেটুকু সীমা ছিল। প্রাণের জ্বালা বাড়তে বাড়তে ভয়ানক একটা কিছু করে ফেলার এমন জোরালো তাগিদ সে ভিতরে অনুভব করে যে নরেন বুঝতে পারে, ভদ্র আত্মীয় বন্ধুর এই পরিবেশে থাকলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের এই সমাজে খাপ খাওয়া একেবারেই অসম্ভব তার পক্ষে। প্রতিদিন অপমান সইতে সইতে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ভয়ানক কিছু করে বসা সত্যই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

তাকে পালাতে হবে এই পরিবেশ ছেড়ে।

গরীবদের মধ্যে, অশিক্ষিতদের মধ্যে, চাষীমজুরদের মধ্যে, পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে!

যারা অন্ধকারে থাকে, শুধু সূর্য্যের আর চাঁদের আলো চেনে, কৃত্রিম আলোয় মিথ্যার সত্যরূপ দর্শন করে বিভোর হয় না—তাদের মধ্যে যেতে হবে। সেখানে কেউ তো তাকে ঘৃণা করবে না অপমান করবে না সে বেকার বলে। উস্কানি দিয়ে দিয়ে তাকে পাগল কার দেবে না।

উপোস করে থাকলেও স্বস্তি আর আত্মমর্য্যাদা বোধটা তো তার বজায় থাকবে। অন্তত মাথাটা ঠিক রাখতে তো পারবে ওদের সঙ্গে থেকে।

মণ্টুর পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র তল্পিতল্পা গুটিয়ে মানে মানে ভাড়া-গোনা ঘরটা ছেড়ে দিয়ে দীননাথ সপরিবারে তার দেশ গাঁয়ের ছেড়ে আসা ভিটেয় ফিরে গিয়েছে।

সেখানে তার বড ভাই প্রাণনাথ আজও টি঺কে আছে কোনরকমে।

এই সহরেই অবশ্য তাকে আরেকটা চাকরী খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু ঘর ভাডা দিয়ে একটা মাসও তার সকলকে নিয়ে এখানে থাকবার মুরোদ কই?

মণ্টুর পরীক্ষার জন্য মাসখানেক কাজ যাবার খবরটা বাড়ী চেপে রেখেছিল। রোজ সকালে যেন দোকানেই যাচ্ছে আগের মত এমনিভাবে বেরিয়ে গিয়ে দুপুরে এসে নেয়ে খেয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে রাত করে ঘরে ফিরেছে।

খোঁজ করেছে কাজের।

একমাসে কাজের হদিস মেলে নি। আরও একমাসে যে মিলবে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

তার চেয়ে ওদের সকলকে দেশে ভায়ের কাছে রেখে নিজে একা সহরে ফিরে যেখানে হোক থেকে যা হোক খেয়ে কাজের চেষ্টা চালানোই ভাল।

নরেন বলেছিল, 'যা বলেছ দীননাথ। সংসারের বোঝা নিয়ে কাজের চেষ্টা পর্য্যন্ত করা যায় না।'

'সংসারের জন্যেই তো চেষ্টা। একটা পেটের ভাবনা কেউ ভাবে? এমনি

না জোটে চুরি ডাকাতি খুন জখম করে জেলে গেলেই চুকে গেল। সরকার থেকে খাওয়াবে পরাবে।'

'খাটিয়ে উসুল করে নেবে।'

নিরীহ গোবেচারী দীননাথের গলায় সেদিন প্রথম রাগের আঁচ আর জ্বালার ঝাঁঝ টের পেয়েছিল।

'খাটতেই তো চাইছি বাবা। প্রাণপনে খেটে খেটে দুটো পয়সা কামিয়েই তো মরতে চাইছি। সকাল থেকে রাত তক্ খেটে আসি নি এ্যাদ্দিন? খাটতে চেয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজ ভিক্ষে চেয়ে। জুটছে কই?'

এ ভাষায় না হোক, নন্দনের মুখে কতদিন যে এই কথাই সে শুনেছে এমনি ঝাঁঝাঁলো স্বরে!

মণ্টু ভাল পরীক্ষা দিয়েছে। সে নিজেও নাকি ভাবতে পারে নি প্রশ্ন পত্রের এত ভাল উত্তর সে দিতে পারবে। এটাই একমাত্র সান্ত্বনা দীননাথের।

সেজন্যই কি নরেনের মত অত বেশী ঝাঁঝ ফোটে না দীননাথের গলায়?

নরেন বলেছিল, 'আমি একবার তোমার দেশের গাঁয়ে যাব ভাবছি—ক'দিন থেকে আসব কিন্তু।'

দীননাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে তো মোদের ভাগ্যের কথা!'

চাকরী হারিয়ে বেকার হয়েও নরেন তার ছেলেকে পড়ানো বন্ধ করে নি, দু'বেলা পড়িয়ে তাকে পরীক্ষায় ভাল ভাবে উৎরে দিয়েছে, এজন্য দীননাথের কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না।

একেবারে সে কেনা হয়ে গিয়েছিল নরেনের কাছে।

কিছু দিন মণ্টুকে ভাল পাশ করানোর জন্য বিনা পয়সায় জিদের বশে পড়িয়ে কি মায়া জন্মে গেছে নরেনের?

মণ্টুর জন্য নরেনের মন কেমন করে।

অন্য কথাও সে ভাবে।

দোকানের সামান্য চাকরী যেতেই দীননাথ দেশে পালিয়ে গেল—গাঁয়ের ভিটেয়। ওই গ্রামে এক পুরুষ আগে তাদেরও ভিটা ছিল।

একবার গেলে দোষ কি ?

সহরে দিনের পর দিন দিন মাসের পর মাস চেষ্টা করেও কিছু হচ্ছে না, একটা বেয়ারার কাজ করে যে হাত খরচটা জুটিয়ে নেবে সে উপায় পর্য্যন্ত তার নেই। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একবার করে দেখলে হয় না জীবিকার সন্ধান ?

দীননাথ বলেছিল, গাঁয়ের মাধ্যমিক স্কুলটা হাই স্কুলে পরিণত হচ্ছে—নতুন কয়েকজন শিক্ষক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখলে দোষ কি ?

শিক্ষকতা না জোটে, চাষবাসের কাজ করতে পারে কি না পরীক্ষা করে দেখবে।

নয় চাষীই সে বনে যাবে।

ছবিরাণীর দায় তো আর নেই !

কিন্তু হায় রে বেকারের কপাল ! গরীবদের মধ্যে গিয়ে একটা মাস গরীব হয়ে কাটাতে গেলে সামান্য যা পয়সা লাগে, তাও তার নেই।

'আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন ?'

সোজা জবাব আসে, 'না। টাকা নেই।'

তারপর আসে তাকে পাঁচটা টাকা দিতে না পারার বাস্তব তিক্ত ব্যাখ্যা—'এগার টাকার মত আছে। কাল সাড়ে সাত টাকার মত রেশন আনতে হবে। তোমার পাঁচ টাকা দিলে রেশন আনা যাবে না।'

চাকরী খুইয়েও মণ্টুকে সে পড়াচ্ছিল বলে আরও বেশী রাগ হয়েছিল বাড়ীর সকলের।

ঝাল ঝাড়বার সুযোগ জুটছিল না।

'ছেলের পড়ানোর কাজও কি করতে পার না ? দুটো পয়সা আসে ?'

'জুটিয়ে দিন না! একটা বেয়ারার কাজ পেলে এখুনি নিয়ে নিই, টুইসনি খুঁজছি না ভাবছেন?'

তারিণী তখন আর কিছু বলে নি।

ছেলের চাকরীর জন্য সেও প্রাণপণে চেষ্টা সুরু করেছিল, এবার একটা টুইসনি জুটিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল।

রবিবার সকালে বাইরে থেকে বাড়ী ফিরেই তারিণী বলে, 'ভূপেশবাবুকে ধরেছিলাম, উনি তোমায় রাখতে রাজী হয়েছেন। সকাল বিকাল একঘণ্টা করে ছেলে আর মেয়েকে পড়াবে। ওঁর সঙ্গে আজকেই দেখা করে কথা বলে সব ঠিক করে আসবে।'

'কত দেবেন?'

'পনের টাকা?'

'দু'বেলা পড়িয়ে পনের টাকা?'

'ছোট ছেলেমেয়ে তো—নীচের ক্লাশে পড়ে। ওর বেশী দেবে না। এখন এতেই লেগে যাও, আরেকটা তো খুঁজতেই হবে।'

'ভূপেশবাবুর না মাষ্টার ছিল?'

'ওকে রাখবেন না।'

ভূপেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তাকে ওই প্রশ্ন করলে সে বলে, হ্যাঁ, মাষ্টার আছে—ভাল পড়ায় না। দশ টাকায় পড়াচ্ছিল—আই, এ, ফেল। আমি ভাবলাম পাঁচ টাকা বাড়িয়েই দি, পাশ করা একজন ওদের পড়াক।'

মনটা খুঁতখুঁত করে নরে নর। তার জন্য একজনের কাজ যাবে!

সেও হয় তো তারই মত বেকার। হয় তো এই দশটা টাকার টুইসনিটাই তার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু সে কাজটা না নিলে কি কোন উপকার হবে ও বেচারার? ভূপেশ পাশ করা মাষ্টার চায়। আরেকজন পাশ করা বেকারকে সস্তায় পেলেই ভূপেশ ওকে বিদায় করে দেবে।

হরিপদ তার অসম বিপদের খবর পায় তার ছেলেমানুষ ছাত্রছাত্রীর কাছে। বাড়ীতে মাষ্টার বদলের আলোচনা শুনে তাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। ন'বছরের উমা বলে, 'আপনিই থাকুন মাষ্টার মশাই? আপনার কাছে পড়তে ভাল লাগে।'

'তোমার বাবা না রাখলে কি করে থাকব?'

তারা ম্লান মুখে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে!

রাত্রে হরিপদ নরেনের কাছে যায়। কোন ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে, 'এটা কি আপনাব উচিত হচ্ছে দাদা? নিজেকে নীচু করে একজনের চাকরী খাওয়া?'

হরিপদর বয়স তার চেয়ে অনেক কম। বোধ হয় দু'এক বছরের মধ্যেই আই, এ, ফেল করে পডা ছাডতে হয়েছে।

নরেন বলে, 'আমাব কি দোষ বল? ছেলেমেয়ের জন্য ভূপেশবাবু বি, এ, পাশ মাষ্টার চান।'

'চান বলেই আপনি যাবেন? গ্র্যাজুয়েট হয়ে পনের টাকায় দু'বেলা পডাতে রাজী হয়ে আমার চাকবীটা খাবেন? উচিত মত বেতন দিত, আপনি পডাতেন, আমাব কিছু বলাব থাকত না। আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েও এত সস্তায় যাচ্ছেন বলেই তো আমাকে তাডাচ্ছে।'

'তুমিও তো সস্তায় পডাচ্ছ—দশ টাকায় দু'বেলা।'

'আমার বয়স কম, আই-এ ফেল কবেছি, আমাব কথা আলাদা। আপনার মত কোয়ালিফিকেশন থাকলে আমি তিরিশের এক পয়সা কমে দু'বেলা পডাতে রাজী হতাম মনে করেছেন?'

এ কথাব লাগসই জবাব নরেন খুঁজে পায় না সত্যই সে নিজেকে সস্তা করেছে। বি-এ পাশ করে দু'বেলা পনেব টাকায় ছেলে পডানো সত্যই অপমানের কথা। কিন্তু তার যে উপায় নেই!

সে তাই বলে, 'সে নয় বুঝলাম। কিন্তু আমি রাজী না হলে তোমার কি লাভ আছে কিছু? ভূপেশবাবু আরেকজনকে নেবেন।'

হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'কেউ রাজী হবে না। এমনিতেই তো অল্প মাইনে দেয়, কিন্তু তারও তো একটা মোটামুটি রেট আছে—কি রকম মাষ্টারকে কত দিতে হবে? আপনি পনেঁর টাকায় দু'বেলা পড়াচ্ছেন জানলে পাড়ার যত বাড়ীতে মাষ্টার আছে তারা আপনাকে গালাগালি দেবে না?'

একটু থেমে হরিপদ আবার বলে, 'আপনারও তো একটু আত্মসম্মান বোধ আছে!'

আছে কি আত্মসম্মান?

তার মত অবস্থার বেকারের কি আত্মসম্মান থাকে? না থাকা উচিত?

হরিপদর ওই কথাটাই তার বার বার মনে পড়ে—যতই সামান্য হোক গৃহশিক্ষকদের বেতন—তারও একটা মোটামুটি মান বাঁধা আছে, তার কমে কেউ ছেলে পড়ায় না।

এ নিয়ম ভাঙ্গলে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে পাড়ার মাষ্টাররা তাকে টিটকারি দেবে, গালাগালি করবে!

এত অন্যায় অবিচারের মধ্যেও তবে নিয়ম ও নীতি আছে?

নবেন ভবে। ইতস্ততঃ করে।

একটু ইতস্তত করেই তার মাথায় চড়ে যায় আগুন। নিজেকে সে ধিক্কার দেয়।

সে না, মরিয়া হয়ে ভয়ানক কিছু করে ফেলার কথা ভাবে? জেলে যাবার কথা ভাবে? এই কি তার নমুনা! এই সামান্য একটা বিষয়ে মন স্থির করতে, মনটা শক্ত করতে, তাকে এত ভাবতে হয়।

আগে সে যায় ভূপেশের কাছে। জানিয়ে দেয় পনের টাকায় সে দুবেলা তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবে না।

ভূপেশ বলে, 'এই রাজী হয়ে গেলে—এই আবার বলছ পারবে না? একটা কথারও কি ঠিক থাকে না তোমাদের?'

এত সস্তায় কিনতে চাইলে কি করে কথা ঠিক রাখি বলুন? সস্তা মানুষের কথা সস্তা হবে না?

বাড়ী ফিরেই সে তারিণীকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

তারিণী রেগে বলে, 'পনের টাকা! পনের টাকাই বা তোমাকে দিচ্ছে কে শুনি? বিড়ি কেনার পয়সা তোমাকে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয় মনে থাকে না?'

'আর চাইব না।'

তারিণীর গলা চড়ে যায়।

'চাকরী জুটিয়ে দিলে যে চাকরী রাখতে পারে না, এক পয়সা যার রোজগার করার ক্ষমতা নেই—'

নরেনেরও গলা চড়ে।

'ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। আমাকে রোজগার করতে না দিলে কি করব?'

সূচনা দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, আজ প্রলয় ঘটে যাবে বাপ ব্যাটার মধ্যে। কিন্তু নরেন বেশীদূর গড়াতে দেয় না ঝগড়াটা, কথা-কাটাকাটি কুৎসিত গালাগালিতে পরিণত হয়ে ওঠার আগেই সে ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

শান্ত ও সংযত হয়ে বলে, 'আমি আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। চাকরী জোটাতে পারলে ফিরব কিনা বিবেচনা করা যাবে।'

ছেলের আকস্মিক দিক পরিবর্তনে এবং বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণায় তারিণী প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়।

তারপরেই গর্জে ওঠে, 'বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড! নিশ্চয় তুই কোথাও চাকরী জুটিয়েছিস্। নইলে কাল টুইশনি নিবি ঠিক করে আজ মত পাল্টাস—বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি বলিস্!'

'চাকরী জুটিয়েছি? যেমন হোক একটা চাকরী জোটাতে পারলে তো সব হাঙ্গাম চুকেই যেত!'

'কিছু একটা না জুটে থাকলে কোন্ সাহসে তুই বাড়ী ছাড়ার কথা বলিস্? কোথায় থাকবি, কি খাবি?'

নরেন বলে, 'আপনার এখানে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভাল। কেন আমি চলে যাচ্ছি, ভাল করে ভেবে দেখবেন।'

সেদিন জামাই অশোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে, তারিনী যে ভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল আজও ঠিক সেই রকম আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে, 'আমি কি করেছি তোর, যে বুড়ো বয়সে আমায় শাস্তি দিচ্ছিস? চাকরী খুইয়েছিস্ বলে খেতে পরতে দিই না তোকে? হাত খরচা দিই না? তোর জন্যে চাকরীর চেষ্টায় দিনরাত—'

তারিণী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে!

নরেন নির্ব্বিকার ভাবে চেয়ে থাকে।

যথারীতি সকলেই এসে জুটেছিল, এতক্ষণ কেউ কথা কইতে সাহস পায় নি।

এবার মা বলে, 'তুই বড় নিষ্ঠুর নরেন। বকাঝকা যদি দিয়ে থাকে, তোর ভালর জন্যই কি দেয় নি?'

তারিণীর কান্না নরেনকে আরও শান্ত, আরও সংযত করে দিয়েছিল।

সে বলে, 'তা দিয়েছে বৈ-কি! বাপ যে ছেলের মন্দ চায় না, আমি তা জানি। কিন্তু এরকম অবুঝের মত ভাল চাওয়ার রকমটা এবার বদলাতে হবে। বুঝে শুনে ভাল চাইতে হবে। ছেলের যেটা দোষ নয় বরং গুণের কথা সেজন্য ছেলেকে দোষী করা চলবে না, গাল মন্দ করা চলবে না।'

উষা মুখ বাঁকায়। যার সোজা মানে এই যে, একটা কাজ জুটোবার মুরোদ না থাকলেই লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ার মুরোদ হয় মানুষের!

কিন্তু মুখ যে সে বাঁকায় নিছক অভ্যাসের বশে, নরেন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে শুনে সে-ও যে রীতিমত ভড়কে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার কথা শুনে।

সে বলে, 'সেকেলে বি-এ পাশ মুখ্যু বাপ নয় কিছুই বোঝে না, একেলে বি-এ পাশ পণ্ডিত ছেলের উচিত তো তাকে বুঝিয়ে দেওয়া! আমারও মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠিক কথাই বলছ। কিন্তু মনে হলেই তো হবে না! ভাল করে একটু

বুঝিয়ে না দিলে কি বলছ তা তো বুঝতে পারবে না! জগৎ সংসার পাল্টে গেছে সবাই এটা জানে। মা বাবা যে রোজ দশবার বলে এটা ঘোর কলি যুগ—তার মানে তো কই বোঝ না তুমি? মা বাবা তো বলছেই যে আগের যুগ নেই, নতুন যুগ হয়েছে। মুখ্যু মা-বাপকে তো বুঝিয়ে দেবে এটা কলি যুগ নয়, নতুন যুগ, সত্য যুগের চেয়ে ভাল যুগ? বুঝিয়ে বলার মুরোদ নেই নিজের কথা, রাগ করে বাড়ী ছেড়ে মা বাপের মনে কষ্ট দেবার গোয়ার্তুমি আছে ষোল আনা।'

বোনের তিরস্কারে নরেন মাথা হেঁট করে না, স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ছেলেমানুষ বোনটার সহজ সমালোচনায় তার আত্মসমালোচনার সঙ্কীর্ণতা ও অসার্থকতা যেন ধরা পড়ে গিয়েছে তার কাছে।

উষা যে রোজ দুপুরে তমালের ঘরে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়, কারো পেটে স্কুলের সামান্য বিদ্যা ছাড়া বেশী কিছু না থাকলেও তারা যে জীবন ও জগতের নানা বিষয় নিয়ে এলোমেলো উল্টোপাল্টা কথা বলাবলির মধ্যে নিজেরা বুঝবার চেষ্টা করে, নতুন যুগের বড় বড় ব্যাপারগুলি—এটা একেবারেই জানা ছিল না নরেনের।

জানা থাকলে সে বুঝতে পারত উষার পক্ষে কি করে সম্ভব হল মেয়েলি লেকচার ঝেড়ে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

ভাবনা চিন্তা করার সময় ছিল না। নরেন হৃদয়ের নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে উষাকে বলে, 'আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি না। রাগ তোরাই করিস্, বুঝবার চেষ্টা করিস্ না।'

'রাগ না হলে চলে যাচ্ছ কেন? তোমায় তো কেউ তাড়িয়ে দেয় নি বাড়ী থেকে?'

'এ অবস্থায় বাড়ীতে থাকা উচিত নয় বলে চলে যাচ্ছি। রাগ হলে শুধু ঝগড়া করেই চলে যেতাম। চাকরী তো আমি একলা করছিলাম না, অন্য যারা করছিল তাদেরও মা বাপ ভাই বোন আছে। নিজের কথা ভাবতে গেলেই ওদের কথা ভাবতে হবে। একজন ছাঁটাই হলে যদি আমরা সবাই চুপ চাপ থাকি—তার মানে

কি দাঁড়ায় জানিস্? যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ছাঁটাই কর, আমরা যারা ছাঁটাই হই নি তারা সবাই চুপ করে থাকব। এটা কি মানা যায়? সহ্য করা যায়?

একজনকে বিনা দোষে ছাঁটাই করলে তাই আমরা সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করলাম—তেরজন ছাঁটাই হলাম। তোমাদের বুঝতে হবে, মানতে হবে, এটা আমার দোষ নয়—গুণ। এটা আমার বোকামির পরিচয় নয়, বুদ্ধির প্রমাণ।'

তারিণীর কান্না থেমে গিয়েছিল নরেনের মা মুখ খুলতেই। কান পেতে সে শুনছিল মেয়ে ও ছেলের কথা।

এবার সে মুখ খোলে, 'একজন ছাঁটাই হলে—'

'বিনা দোষে ছাঁটাই হলে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাই বলছি আমি। একজন বিনা দোষে ছাঁটাই হলে হাঙ্গামা করাটা তোমরা ভাল ভেবেছ—আর কাউকে ছাঁটাই করতে সাহস পাবে না। কিন্তু একজনের ছাঁটাই ঠেকাতে তোমরা তেরজন যে ছাঁটাই হয়েছে, কিছু করতে পেরেছ সেজন্য? ঘরের ভাত খেয়ে খেয়ে তেড়িবেড়ি করা ছাড়া?'

অজ্ঞতাটা প্রকাশ পায় তারিণীরই কিন্তু সেজন্য নরেন নিজে লজ্জা বোধ করে। সে শুধু ঝগড়াই করেছে বাপের সঙ্গে যে সে একলা নয়, আরও তেরজন চাকরী হারিয়ে বেকার হয়েছে তার সঙ্গে,—এ আরেকটা খবর বাপ্‌কে জানানো সে দরকার মনে করে নি যে তেরজনকে বরখাস্ত করার জন্য আজ তিন মাস সাড়ে সাত শ' লোকের চাকরী করা বন্ধ। আপিস বন্ধ, কারখানা বন্ধ। তেরজনকে চাকরী না দিলে কেউ তারা আপিসে চাকরী করবে না কারখানায় খাটবে না—দরকার হলে না খেয়ে মরবে। এসব কথা কিছুই সে জানায় নি তারিণীকে। ধরে নিয়েছে যে তারিণী সব জানে, সব জেনেও চাকরী হারানোর জন্য তাকে গঞ্জনা দেয়।

নরেনের লজ্জাবোধটা কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে যায় রাগে। কেন তারিণী এমন অজ্ঞ হবে? এতবড় গুরুতর ব্যাপার সম্পর্কে কোন খবর রাখবে না?

একটা যেন সুযোগ জুটেছে, অজুহাত জুটেছে ঝগড়া করবার।—

নরেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'রাগ করব না?— সাত আট শ' লোক কাজ বন্ধ করল, আপিস বন্ধ হল, কারখানা বন্ধ হল,- বাবা খালি বলছেন, তুই কেন চাকরী হারালি। ওদের সঙ্গেই তো চাকরী করব আমি? না একলা সকলের বিপক্ষে দাঁড়াব?'

তারিণী বলে,—'এ'কথাটা তো তুমি বাপু জানাও নি আমায়! তোমার চাকরী যাবার পর তিন চার বার তোমার আপিসে গিয়েছি· দেখেছি দিব্যি সবাই চাকরী করছে।'

কিছুদিন সময় লাগবে না? ষ্ট্রাইক হয়েছে পরের মাসে পয়লা থেকে।'

মা বলে, 'যাক গে যাক, ওসব বোঝাপড়ার ব্যাপার যাক। তুই বাপু মাথা ঠাণ্ডা রাখ্।'

"মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্যেই আমি আজ চলে যাচ্ছি।

'আর আসবি না?'

'আসব বৈ-কি!'

উষা বলে, 'একটু সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলো না কোথায় যাবে, কি করতে যাবে?'

তিলক কণ্ঠী আর গেরুয়া কাপড় পরা অর্দ্ধ উলঙ্গ ঠাকুর্দ্দার তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে উদাসভাবে নরেন বলে, 'চাকরীর চেষ্টায় মাসখানেক ঘুরে বেড়াব ভাবছিলাম।' তারপর সে সোজাসুজি তারিণীকে বলে, 'আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন?'

'চাকরীর চেষ্টায় বেরোবে? দাঁড়াও, দেখি।'

পাঁচটা টাকা চেয়েছিল, দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দেয়।

বলে, 'সাবধানে থেকো, মাঝে মাঝে পোষ্ট কার্ডে কুশল দিও।'

পোষ্ট কার্ডে কুশল দিতে বলার মানেই পোষ্টকার্ড আর খামের দামের তফাৎকে মর্য্যাদা দেওয়া।

দীননাথের দাদার নাম প্রাণনাথ। মা বাবা প্রাণের চেয়ে ভালবাসত। কিন্তু

সেজন্য বোধ হয় নয়। তারা কি আর জানত যে ছেলেকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাসে? বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগের প্রায় তিন ভাগ বিদ্যা ছেলেবেলা পেটে গিয়েছিল বলেই বোধ হয় যাদব ছেলের জিভ জব্দ করা, দাঁত ভাঙা নাম রেখেছিল প্রাণনাথ – যদু, মধু, পাঁচু, হাঁদা, ইত্যাদি এত সহজ সহজ নাম রাখবার প্রথাটা চালু থাকতেও।

বাপের বিদ্যা ফলানো কোন কাজেই লাগে নি প্রাণনাথের। কেউ ভুলেও তাকে প্রাণনাথ বলে ডাকে না। নিজেও সে এক রকম ভুলে গেছে তার ওরকম একটা ভাল নাম, আসল নাম, দেওয়া হয়েছিল।

সবাই তাকে পরাণ বলেই ডেকে আসছে চিরকাল। সেই দুঃখেই কি প্রাননাথ নিজের ছেলের আরও বেশী জমকালো নামকরণ করেছিল—জগদীশ্বর? কিন্তু সেও দশজনের কাছে এবং নিজের কাছে পরিচিত হয়ে আছে জগা নামে!

পরান রোগে শয্যা নিলে তের বছর বয়সে নাথপুরের কারখানার বাতি লণ্ঠনে লাগাবার কাজে ভর্তি হবার সময় সে নিজেই নিজের নাম দাখিল করে জগা!

'নাম কি লিখব রে?'

'জগা লেখেন।'

'আরে শূয়ার, তোর নাম জগা তা জানি। পদবীটা বল?'

'পদবী— ?' পদবী? পদবী লেখেন গুঁই।'

নিজের জগদীশ্বর নামটা ঘোষণা না করে সে বোধ হয় মোটা কালো প্রণবেশ্বরের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

ভবেশ্বর বাবুর সুপারিশে বং মাখার কাজে এপ্রেন্টিস ভর্তি হতে এসে সে যদি বলত যে নাম তার জগদীশ্বর গুঁই, প্রণবেশ্বর চক্রবর্তী বোধ হয় হাসির চোটে ভুঁড়ি ফেটে মারা যেত।

বাড়ীতে ঢুকে সবার আগে নরেনের চোখে পড়ে পরাণের একলা থাকার খুপরি ঘরটা।

সমস্ত বাড়ীটা সকলকে ছেড়ে দিয়ে সে গোয়াল ঘরের কোণায় হাত দুই চওড়া হাত পাঁচেক লম্বা এই খুপরিটা বানিয়েছে।

সারাদিন সে ওখানে পড়ে থাকে।

মাঠে গিয়ে চাষবাসের কাজ করার তার ক্ষমতা নেই। কোন কাজ করারই ক্ষমতা নেই।

দুটি হাতই তার আধখানা করে কাটা। তেভাগার হাঙ্গামার সময় ওই দু'হাতে লাঠি ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে যাবার ফল।

তার ওই দিবারাত্রি থাকার খুপরিতে তিনটে কাঠের তাক।

উপরের তাকে ছোট বড় নানা আকারের মাটির ভাঁড় আর সরা—চুণ কালি আর ওই রকম সাধারণ ঘরোয়া রং দিয়ে বিচিত্র রকমে চিত্রিত করা। হাত থাকতে পরাণ নিজের হাতে এগুলি চিত্রিত করেছিল। প্রত্যেকটি ভাঁড় আর সরার গায়ে যেন তার চাষাড়ে মোটা হাতের স্মৃতি চিহ্নের আল্পনা আঁকা।

মাঝের তাকে কয়েকটা বই আর পুঁথি। বই বলতে বাপের আমলের রামায়ণ মহাভারত আর ব্রতকথা পাঁচালীর প্যামফ্লেট। সবগুলিই জীর্ণ পুরাণো হয়ে গেছে। চাঁপা নিয়মিতভাবে পাড়ার মেয়েদের এইগুলি পড়ে শোনায় বলেই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বইগুলি টিকে আছে

যে-সব বই ঘাঁটাঘাটি হয় সে-সব বইতে উই ধরে না!

নীচের তাকে কিছুই নেই।

শুধু সিঁদুর লেপা একটি ফটো। আস্ত বাতাসা একটাও নেই, ধুলোর মত একটুখানি বাতাসার গুড়ো। দু'একটা সস্তা জবা-গাঁদা শিউলী ফুল।

এই তাকের সামনে যোগাসনে বসে পরাণ রোজ সকালে বিকালে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দু'একটা পুঁথি নিয়ে পড়ে।

বাড়ীর লোক তাকে খেতে ডাকতে সাহস পায় না।

কে জানে? হয় তো ধ্যান ভঙ্গ হলে পরাণ খেঁকিয়ে উঠবে।

কোথাও কিছু নেই পরাণ গর্জন করে ওঠে, 'একছিলুম তামাকও তোরা দিতে পারিস না?'

হয় তো বেলা দুপুর, পেটে খিদে নিয়ে ভাতের বদলে পরাণ তামাক চায়। বাড়ীর লোকে তার ধাত জানে—খাওয়ার কথা না বলে তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দেয়।

জগা বা চাঁপারা নরেনকে চিনতে পারে না। কিন্তু নরেনকে দেখেই পরাণ বলে, 'চিনেছি গো, চিনেছি। জগা তুমাকে চিনলে না? তা চেনা-চিনির কারবার তো চুকিয়ে দিয়েছে তুমার বাবার বাবা, তিরিশ বছর আগে। তুমি হঠাৎ এলে কেন ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরছে বাবা।'

দীননাথ বলে, 'মণ্টুকে পড়াতেন, একবার আসবেন বলেছিলেন।'

পরাণ হাসে।

মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁপ দাড়ি। পনের বিশ দিন কামায় নি—মাসে একবারই সে কামায়।

তবু সমস্ত মুখটাই যেন তার হাসে।

'এসেছ বেশ করেছ। হাজার বার এসবে। বড় দুরবস্থা কিনা তাই বলছিলাম কি, তেমন আদর খাতির চেয়ো না কিন্তু। সে দিনকাল নেই। ঠাকুদ্দা ফি বছর দশ সেরি রুই, দারোগা বাবুকে নজর দিত। বিল পুকুরে দু'সেরি একটা মাছ মেলে না আজকাল।'

'দারোগাবাবুকে নজর দিতেও হয় না তো আজকাল!'

'হয় না? আগে ছিলেন দারোগাবাবু, আজকাল কত রকমের কত যে বাবু হচ্ছেন ঠিকানা আছে? তবে হাঁ, সবার জন্যে দশ সেরি রুই লাগে না।'

মুখে যাই বলুক, পরাণ যথাসাধ্য অতিথিকে সমাদর করার আয়োজন আরম্ভ করে—অসাধ্য সাধনের চেষ্টাও করে।

নরেনের বাবা যখন বছরে পূজাপার্ব্বন উপলক্ষে অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য দেশের বাড়ীতে আসার প্রথাটা পালন করে চলত, তখনও পরাণের যে পরিমাণ

জমি ছিল, আজ তার সিকিও নাই! যে পরিমাণ জমি ভাগে নিয়ে চষত, আজ তার সিকিভাগ পায় না।

জমি নিয়ে নিয়েছে বর্গাদার। অর্দ্ধেকের বেশী নিজে ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করায়।

কিন্তু তারিণীর ছেলে দু'দিনের জন্য বাড়ীতে এসেছে। খেয়ালের বসেই আসুক আর যে জন্যই আসুক, দরকার হলে বাড়ীর সকলের দু'চার দিন উপোস ক'রেও তাকে খানিকটা সমাদর করতে হবে।

নরেন টের পেয়েই ঝোলানো থলিতে সামান্য তল্পি-তল্পা গুটিয়ে, সুজনিটা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বলে, 'আমি বাবু বিদায় হলাম।'

পরাণের মেজ ছেলে জেল খাটছে জমির ব্যাপার নিয়ে জমিদারের গুণ্ডা লেঠেল আর পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করার অপরাধে।

জগা অতি কষ্টে সামলে গেছে।

জগা বাঁশের লাঠিটা বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে একগাল হেসে বলে, 'বললেই হল বিদেয় হলাম? অপরাধটা কি করেছি বলতে হবে তো? চাষাভুষো মানুষ—মুস্কিলে মুস্কিলে মাথাটাথা তায় আবার গুলিয়ে আছে। তা, বুঝিয়ে বললেও কি বুঝব না, ঘাট হল কিসে?'

নরেন বলে 'ঘাট বৈ-কি! বাপদাদার ভিটে দখল নিয়েছে জ্ঞাতি খুড়োরা, তাই বলে গিয়ে উঠলে কি আদর যত্ন কম করত? মাছ দুধ কম খাওয়াত? পরাণ খুড়োর ঘরে কেন উঠলাম যদি না বুঝে থাকো—'

বলতে বলতে নরেনের খেয়াল হয় সে ভাষা ভুলে গেছে,—গেঁয়ো আর গরীব বিপন্ন চাষীদের সঙ্গে কথা বলার ভাষা!

সে বোঝে, জগার তেল পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি বাগিয়ে রুখে দাড়ানোটা খাতিরেরই একটা প্রতীক, গটগট করে চলে গেলে সত্য সত্যই কি আর সে মাথায় তার লাঠি বসিয়ে দেবে অপমানে!

হয় তো নিজের মাথাতেই লাঠির একটা ঘা বসিয়ে বলবে, 'ধেৎ, মোদের জন্মো

বৃথা! যদি বা এল এ জনা, মন বুঝে রইতে দেবার বুদ্ধিটুকু ঘটে গজাল না। অবমান হয়ে রেগে চলে গেল!'

সে বোঝে। কিন্তু জগা যেমন মিছেমিছি লাঠি বাগিয়ে ধরে হাসি মুখে পরিষ্কার করে বুঝিয়েছে তার কথা, সে কিন্তু নিজের মিছামিছি থলি গুছিয়ে বিদায় নিতে চাওয়ায় আসল মানেটা ওকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না!

গেঁয়ো হোক অসভ্য হোক সমস্ত পরিবারে পক্ষ নিয়ে জগার এই প্রতিবাদের কোন সরল সহজ জবাব খুঁজে না পেয়ে অগত্যা সে কাব্যিক ভাষা আশ্রয় করে।

মেয়েরা পর্য্যন্ত খিড়কিতে গোয়ালে শূন্য জীর্ণ ধান বোঝাই করার পুরাণ গোলাটার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, চেয়ে আছে স্থির উৎসুক দৃষ্টিতে। তাদেরও যেন জিজ্ঞাসা: সহর থেকে হঠাৎ আপন হয়ে কেন এলে বাবু? আপন করতে চাইলাম বলে বাগ করে কেন চলে যাচ্ছ?

দীননাথ বা মণ্টু মুখ খোলে না, একটি কথা বলে না। এখন মুখ না খোলাই সব চেয়ে ভাল পন্থা!

কাব্য ছাড়া গতি নেই।

নরেন বলে, 'প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে জগাদাদা।'

জগা দাদা!

চাষী মেয়েপুরুষ কটা যেন চমকে ওঠে!

জগা হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফাঁকা গোয়ালটার দিকে। মুখের হাসিটা সে আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভানোর মত!

হাত জোড় করে বলে, 'কি অপরাধটা হল মোদের?'

নরেন তখন হিসাব নিকাশ কাব্য কবিতা সব ভুলে বলে ওঠে, 'হাত জোড় করছ কেন? তামাসা করছ কেন? আমি কি দারোগা না নায়েব বাবুর

পেয়াদা এসেছি তোমাদের ঘরে? একটু প্রাণের জ্বালা জুড়োতে এলাম তোমাদের কাছে, তোমরা খালি দূর দূর করছ—বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর—সহরের বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর। আমি এলাম একভাবে—'

নরেন থেমে যায়। সে কেন এসেছে, কি ভেবে এসেছে, কি চেয়ে এসেছে এদের বোঝানো কি সম্ভব তার পক্ষে?

কিন্তু তার নিরুপায় প্রাণের জ্বালার ভাষাটা বুঝে যায় সকলেই।

জগা হাত চেপে ধরে নরেনের।

বলে, 'ভাই, হঠাৎ কেন আসেন, হঠাৎ কি বলেন, বুঝে উঠতে পারি কি? কেউ পারে? জীবন মরণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে—পাঁচ দশ বছর বাদে মোরা শেষ হয়ে যাব কিনা কে জানে, বলেন?'

পরাণ বলে, 'জগা, বাবুকে যেতে দে। সহরে ফিরে গিয়ে যা খুসী বলুন মোদের নামে। গেরাহ্য করি নে কো।'

জগা গর্জন করে ওঠে, 'চুপ কর দিকি বোকা হাবা? জমিগুলো খুইয়ে দিলে বাবুদের সাথে ভালমানুষি করে। কিছু বুঝবে না শুনবে না, ফপরদালালি করে সব গোল্লায় দেবে।'

পরাণ দমে যায়। ছেলের কাছে এমন ধমক—তাও আবার দীননাথের সামনে তারিণীর ছেলের সামনে!

উঠানে নেমে এসে সে সবিনয়ে নরেনকে বলে, 'যাবেন কেন, থাকেন না? কষ্ট পাবেন, তবু থেকে যান। মোরা কি অবস্থায় আছি—'

জগা ধমকের সুরে বলে ওঠে, 'চুপ কর দিকি। মোরা কি অবস্থায় আছি জানতে কি এসেছেন? বাবু জ্বলছেন নিজের প্রাণের জ্বালায়। একটু জুড়োতে এসেছেন মোদের কাছে। তুমি সুরু করে দিলে নিজের গাউনি।'

নিজে তার কাঁধ থেকে তল্পিতল্পার থলিটা নামিয়ে নিয়ে, হাত ধরে তাকে দাওয়ার দিকে নিয়ে যেতে যেতে জগা হাঁক ছাড়ে—'চাটাইটা দাওয়ায় বিছিয়ে দাও কেউ!'

চাটাই-এ বসে নরেন শান্ত গলায় বলে, 'তুমি ভাই ধরেছ ঠিক। প্রাণের জ্বালা জুড়োতেই এসেছি। তা দেখছি কি, তোমাদের প্রাণেও জ্বালা বড় কম নয়।'

জগা মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

জগার বৌ চারু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কথাগুলি শোনার জন্যই দুয়ারের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ঘোমটার আধ ঢাকা মুখ তুলে সে নরেনের দিকে একবার তাকায়। ঘোমটা একটু টেনেছে কিন্তু পরণের কাপড়খানা আর পরবার মত নেই—কোনমতে কাজ চালানো।

নরেন আরও কিছু বলে কিনা শোনবার জন্যই সে বোধ হয় একটু অপেক্ষা করে।

নরেন যেন নিজের মনেই বলে, 'ভালই হল এসে। জ্বালা মেলাতে গিয়ে প্রাণে প্রাণে মিল হবে।'

জগা বলে, 'মিল বরাবর রয়েছে প্রাণের—জ্বালাটা তফাৎ ধরে নিই বলেই তো এত ভুল বোঝাবুঝি।'

'তা মন্দ বল নি। তবে পেটের জ্বালা এবার সব জ্বালা একাকার করে দিচ্ছে। তোমার পেট আমার পেট একভাবেই জ্বলে কিনা। প্রাণের জ্বালাও একাকার হয়ে যাচ্ছে।'

বিশেষ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। কিন্তু শাকভাত তারা আধপেটা খাক, অতিথিকে তো পেট ভরে খেতে দিতে হবে !

সামান্য আয়োজনে যত্নের বহরটা নরেনকে বুঝিয়ে দেয়, একদিনের সম্পন্ন চাষী পরাণের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে।

তার একার নয়। চাষী সমাজের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে বুঝতে একবেলাও সময় লাগে না নরেনের।

নাথুপুরের নীচু স্কুলটা উঁচু স্কুলে পরিণত হতে চলেছে বটে, নতুন বছর সুরু

হতেই দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া শুরু হবে বটে এবং সেজন্ত কয়েকজন নতুন শিক্ষকও দরকার হবে বটে—কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায় নরেনের ভাগ্যে এই স্কুলে শিক্ষকতা করার স্বযোগ জুটবে না।

নাথপুর এবং আশেপাশের গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই কেবল এই স্কুলে চাকরী দেওয়া হবে—আগামী স্কুলের বর্তমান অস্থায়ী স্কুল কমিটিতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ পদের জন্য নামও স্থির হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। স্বতরাং নরেনের দরখাস্ত করে কোন লাভ নেই।

মালতী বলে, 'ছাখেন কেমন জব্দ হলেন। সহর ছেড়ে গাঁয়ে এসেছেন চাকরী খুঁজতে!'

জগা বলে, 'চাকরী খুঁজতে নয়—প্রাণের জ্বালা জুড়োতে।'

মালতী বলে, 'চাকরী পেলেই জ্বালা জুড়োয়!'

গাঁয়ে এসে মালতী তাজা হয় নি, অসুস্থতার ছাপটা তেমনি বজায় আছে তার মুখে—কিন্তু এখানে এসে তার মুখ খুলেছে। মণ্টুকে পড়াতে তাদের সংবের বাসার মধ্যে নরেনের রোজ অনেকক্ষণ সময় কাটত, মাঝে মাঝে ছোট ভাইবোনগুলিকে ধমকানো ছাড়া মালতীর মুখে কোন কথা শুনেছে বলে সে মনে করতে পারে না।

এখানে মালতী নিজে থেকে যেচে এ বিষয়ে ও বিষয়ে—সহজভাবে নানা কথা কয়। সহরে মূক হয়ে ছিল, গাঁয়ে এসেই সে যেন মনের ভাব প্রকাশ করায় ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

দীননাথ আর মণ্টু হয়ে গেছে চুপচাপ!

তার দাদার অবস্থা যে এত বেশী কাহিল হয়ে পড়েছে সপরিবারে এখানে এসে পৌছানোর আগে দীননাথ সেটা অনুমান করতে পারে নি।

এরা নিজেরাই পেট ভরে খেতে পায় না, তার পরিবারটিকে এদের ঘাড়ে বেশীদিন চাপিয়ে রাখা তো স্ববিবেচনার কথা হবে না।

পনেরদিন এক মাস ওরা কষ্টকর জীবনযাত্রায় আরও বেশী কষ্ট আমদানী করা সয়ে যাবে কিন্তু বেশীদিন সকলকে ঘাড়ে চাপিয়ে রাখলে অভাবের জ্বালায় পুড়ে যাবে দুটি ভায়ের এবং দুটি ভায়ের পরিবারের মধ্যে এতদিন দূরে বাস করার জন্য বজায় থাকা হৃদ্যতা ও মিল।

এখানে বরাবর একসঙ্গে থেকে চাষবাসের কাজ করে এসে ছিল, অন্য কথা—যতই দুঃখ দুর্দ্দশা আসুক কারো উপায় থাকত না অপরকে দায়ী করার, সকলেরই হত সমান কর্মভোগ।

কিন্তু নিজের অংশের জমিজমা বেচে দিয়ে ছেলেকে বিদ্বান করতে মানুষ করতে দীননাথ সহরে চলে গিয়েছিল। জমিজমায় কোন অংশই তার নেই। ভিটেটুকুর অংশে কেবল তার অধিকার।

আজ ওদের এই দুরবস্থার সময় এতগুলি পেটের দায় ঘাড়ে চাপিয়ে ওদের দফা নিকেশ করা চলে না!

দীননাথ চুপচাপ এই সমস্যার কথা ভাবে।

মণ্টু ও ভাবে।

দীননাথের ভাবনা চিন্তা সবই ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে করা, ছেলের সঙ্গেই সব ব্যাপার নিয়ে তার শলা পরামর্শ।

দিন তিনেক পরেই দীননাথ বলে 'না, বসে থাকা কাজের কথা নয়। মণ্টুকে নিয়ে ফিরেই যাই, কাজকম্মের যোগাড় দেখি।'

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার একটা কারণ নরেন সহজেই অনুমান করতে পারে—পরাণের বোঝা যতটুকু পারা যায় কম করা। মণ্টু তার সঙ্গে গেলে একটা পেট ভরানোর দায় তো কম হবে পরাণ ও জগার।

মণ্টুকে সঙ্গে নেবার আরেকটা কারণ সে শোনে দীননাথের মুখে। গাঁয়ে বসে জেঠার অন্ন ধ্বংস করে কি লাভ? পড়াশোনা আর হবে কি হবে না সে তো পরের কথা—পরীক্ষার ফল বেরোলে!

সহরে গিয়ে মণ্টু যদি কিছু রোজগার করতে পারে!

'দু'চার পয়সা কামিয়ে কোনমতে নিজের পেটটা যদি চালিয়ে দিতে পারে তো তাই ঢের।'

নরেন ভাবে, কি আশা দীননাথের! নিজে সে সহরে যাবে কাজের খোঁজে, কোথায় থাকবে কি খাবে, কতদিনে কাজ জুটবে নিজেই সে তা জানে না, তবু সে মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে যদি সে অন্তত নিজের জীবিকাটা অর্জন করতে পারে!

নরেন বলে, 'আমিও কদিন বাদেই ফিরে যাব।'

৬

নরেন নামেই পরাণের অতিথি। একবেলা পাতা পাড়ে তো দুদিন আর সে গরীব বেচারাদের অন্নে ভাগ বসায় না।

পরাণ আর জগাকে বুঝিয়ে বলে, 'ভেবো না তোমরা গরীব বলে ঠেকিয়ে চলছি। চাদ্দিকে আত্মীয় কুটুমের বাড়ী ছড়ানো, দেখা করতে গেলে একবেলা না খাইয়ে ছাড়ে না। কতকাল পরে দেশ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছি—সকলেই একটু আদটু যত্ন কবতে চায়।'

পরাণ বলে, 'হাঁ, সে ঠিক কথা।'

আত্মীয় স্বজন সত্যই আদর যত্ন করতে চায় এবং যথাসাধ্য করেও। নরেনের ভদ্রলোক আত্মীয়স্বজন।

যথাসাধ্য করে!

কিন্তু তাদের অধিকাংশের সাধ্যটা কি পরিমাণ কমে গেছে আঁচ করে নরেন বড় দমে যায়। তার নিজের জীবনে যে সমস্যা, যে সংকটের সামনে আজ সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, সহরের গাদাগাদি করা মানুষের জীবনে যা বিকটরূপে প্রকট—গ্রামাঞ্চলেও তার ব্যাপকতা তাকে বিচলিত করে দেয়।

পোষ্য অনেক। আয় নেই।

অনেকের আবার ধরা বাঁধা কিছুই আয় নেই। ধরা বাঁধা আয় নেই তবু কি করে দিন চলে এ ধাঁধাঁর জবাব সহরে বসে খুঁজে পেত না। এখানে এসে বুঝেছে।

এই সব নিরুপায় আত্মীয়স্বজনের বাড়ী দেখা করতে গেলে তারা বিব্রত বোধ করেছে তাকে একবেলা খেতে বলা দূরে থাক—একটু জলখাবারও দেয় নি। দেয় নি মানে দিতে পারেনি।

অন্যদের কারো বাড়ী একবেলা, কারো বাড়ী দু'একদিন থেকে এবং খেয়ে, এক মাসীর বাড়ী সাতদিন কাটিয়ে প্রায় একটা মাস নরেন একরকম বিনা খরচায় পার করে দিল।

মাসীর অবস্থা ভাল। আরও কয়েকদিন থাকার জন্য সাধাসাধিও করেছিল। কিন্তু বিনা খরচায় পরের খেয়ে বাঁচার জন্য তো সে দেশে আসে নি!

সকলের দেওয়া আঘাতের সঙ্গে ছবিরাণীর আঘাতের বেদনা ভুলতেও আসে নি।

সে এসেছে মনটা গুছিয়ে নিয়ে শক্ত করতে।

কিন্তু আর পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই।

এবার সহরে ফিরে যাওয়াই ভাল।

মাসীর বাড়ী, ভিন্ন গাঁয়ে। ওখান থেকে সোজা সহরে ফিরে না গিয়ে সে একবেলার জন্য পরাণের বাড়ী পাত পাততে ফিরে আসে।

ওদের কাছে বিদায় না নিয়ে সহরে ফেরা যায় না।

সকালে এসে দুপুরের গাড়ী ধরে কলকাতা রওনা দেবার কথা ভেবে সে আসে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার সহরে ফিরে যাওয়া পিছিয়ে যায় আরও পাঁচ দিন।

তার মধ্যে দু'দিন কাটে হাজতে।

পরাণের বাড়ী পৌঁছে সে ছাখে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—সোজাসুজি তার জন্য না হলেও তাকেও যে ঘটনার একটা উপলক্ষ, বলা যায়।

একটা পোষ্টকার্ড লিখে সে খবর জানিয়েছিল। তাকে দেয়ার মত একখানা

চাল পরাণের বাড়ীতে নেই। যে চাল কিছু আছে সে চালের ভাত তাকে খেতে দেওয়া যায় না—সহরবাসী একবেলার অতিথির পাতে দেওয়া যায় না।

জমির মালিক শিবরাম জোর করে তাদের ধানও নিজের গোলায় তুলেছিল—এই নিয়ে হয়েছিল বচসা। সেই রাগে শিবরাম আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাদের ধানও আটক করেছে।

তাদের ভাগ তারা আদায় করবে, সে ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা তো চটপট হয় না গরীব চাষীর ভাগ্যে। অথচ কিছু ধান না হলে এদিকে অতিথিকে অখাদ্য চালের ভাত খাওয়াতে হয়।

কাল সকালে জগা গিয়েছিল কিছু ধান চেয়ে আনতে। সঙ্গে গিয়েছিল দীনু আব হানিফ।

কিছু ধান না হলে তাদের ঘরেও উপোস সুরু হবে দু'এক দিনের মধ্যে।

ভাগ নিয়ে কলহের ফয়সালা পরে হবে, আজ তাদেব ভাগের ধানের সামান্য একটা অংশ দেওয়া হোক—এই দাবী তারা করেছিল শিবরামের কাছে।

জগা কি করেছিল বাড়ীর লোকেব জানা নেই। তবে এটুকু তারা অনুমান করতে পেরেছে যে, ধান দিতে নিশ্চয় অস্বীকার করেছিল শিবরাম, জগার মেজাজ নিশ্চয় গরম হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে শিবরামের লোক লাঠি মেবে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

এখন পর্য্যন্ত জগার জ্ঞান হয় নি।

শিবরামের লোকেরাই তাব মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে দীনু আর হানিফেব সঙ্গে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছে।

আর দিয়েছে দশ সের ধান।

দীনু আর হানিফকেও দশ সের করে ধান দেওয়া হয়েছে।

শিবরামের লোক বলেছে, জগা নাকি ধান মেপে দেবার পর অতিথির জন্য শিবরামের কাছে দুটি ডাব চেয়েছিল। ডাব পাড়তে গাছে উঠবার সময় পড়ে গিয়ে জগার মাথা ফেটে গেছে।

হানিফ আর দীন্থ নাকি ধান নিয়ে খানিক তফাতে চলে গিয়েছিল. ডাক শুনে তারা ফিরে যায়, তারা কিছু ছাখে নি।

ঘোষ পাড়ার বার বছরের ছেলেমানুষ গোলক কিন্তু খানিক তফাৎ থেকে ব্যাপারটা দেখেছে। জগার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল শিবরামের, তার লোক শম্ভু হঠাৎ জগার মাথায় লাঠি বসিয়ে দেয়।

ধান মাপা হয় পরে। জগার মাথা বেঁধে দেওয়ারও পরে।

ঘটনাটা হয় শিবরামের বাড়ীর পিছনে পুকুর ধারে—তার নিজস্ব পুকুর। শিবরাম তখন পুকুরে ছিপ ফেলছিল।

যায়গাটা এমন যে, ঘটনাটা বেশী লোকের চোখে পড়া সম্ভব না হলেও গাঁয়ের দু'একজন বয়স্ক লোক যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে জানা যাচ্ছে না ছেলেমানুষ গোলক ছাড়া আর কে জগার মাথায় লাঠি মারতে দেখেছিল।

গোলক প্রথমে কয়েকজনের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল, তারপর খুব সম্ভব বাড়ীতে অথবা শিবরামের লোকের হাতে মারধোর খেয়ে পাংশু বিবর্ণ মুখে সেও এখন অস্বীকার করছে নিজের চোখে ঘটনাটা দেখার কথা।

নরেন বলে, 'দীন্থ আর হানিফ নিশ্চয় কাছে থেকে সব দেখেছে, বলছে কিছু ছাখে নি! ছি ছি! এতবড় অন্যায়টা চাপা পড়ে যাবে!'

চাষী আন্দোলনের পাণ্ডা, বংশী ঘোষাল, জগার খবর নিতে এসেছিল।

নরেন তাকে বলে, 'গাছ থেকে পড়েছে না মাথায় লাঠি পড়েছে সেটা তো মাথা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।'

বংশী বলে, 'তা যায় বৈ-কি! সেই জন্তেই তো আসল ডাক্তার আনা। নইলে মাথার ব্যাণ্ডেজ আমিই বেঁধে দিতে পারতাম।'

'চাষীরা চুপচাপ সয়ে যাবে?'

'তাই কি যায়? ওর হুঁশ হোক, কি হয়েছিল নিজের মুখে সব বলুক, তবে তো বিহিত হবে।'

বংশীর এ কথাটার তাৎপর্য্য তখন নরেন বুঝতে পারে নি—পরে বুঝেছিল।

বংশীর তাড়া ছিল। সে চলে যায়।

পরাণকে বলে যায়, 'আমি আবার আসব—তার আগে যদি হুঁশ হয় তো খবর দিও।'

নরেন বলে, 'মণ্টু, দীনু আর হানিফের ঘর চিনিস্?'

'চিনি বৈ কি!'

'চল্ তো আমার সাথে।'

নরেন পৌঁচেছিল খুব ভোরে, এখন সকালে সূর্য্য উঠেছে ডগডগে লাল। চারিদিকে হাল্কা কুয়াশা। মানুষের মনের টক কষ্টের ছোঁয়াচ লেগে বাতাস যেন দুধের মত কেটে গেছে। একটা আবর্জনার স্তূপে কাল রাত্রে আগুন দেওয়া হয়েছিল, কটু ধোঁয়াটে গন্ধ চারিদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গুমরে গুমরে এখনো আগুন জ্বলছে আবর্জনায়। ধোঁয়া উঠছে সোজা উপর দিকে, সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে।

রাস্তা ছেড়ে মণ্টু ক্ষেতে নেমে যায়। নরেনকে বলে, 'আল ধরে যেতে পার-বেন তো?'

'চুপ কর ফাজিল।'

ক্ষেত ডিঙিয়ে গেলে পথ সংক্ষেপ হবে। মণ্টুর অভ্যাস আছে, পথও তার চেনা, আল ভুল করে শস্য ক্ষেতের গোলক ধাঁধায় পাক খেয়ে বেড়াতে হবে না। মণ্টুর পিছনে নরেন চলতে থাকে আর ভাবে এর মধ্যেই কোন জমির টুকরোয় হয় তো জগা ফসল ফলিয়েছিল, যে ধান আজ শিবরামের গোলায়।

দীনুর ঘরের দশা দেখেই টের পাওয়া যায়, কতকাল তার ঘর ভাল করে মেরামত করা হয় নি।

দীনুর বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। ভাঁটা ধরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, এককালে লাঠিয়াল হিসাবে খ্যাতি ছিল। দশ বছর আগেও নাকি তার অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল, তার আজকের চেহারার ভাঁটা 'ধরা অবস্থা দেখেও সেটা বোঝা যায়।

ডাক শুনে দীনু বাইরে আসে, মন্টুর সঙ্গে নরেনকে দেখেই সে বিষম রকম ভড়কে যায়। মন্টুকে সে চেনে, নরেন একেবারে অচেনা।

মন্টু তাকে নরেনের পরিচয় দেয়, কিন্তু দীনুর বিব্রত শঙ্কিত ভাবটা কিছুতেই ঘোচে না।

নরেন বলে, 'আমি ওই হাঙ্গামার ব্যাপারটা একটু জানতে এসেছি, পরাণের ছেলে কেন মার খেল কি বৃত্তান্ত।'

'পরাণের ছেলে মার খেয়েছে নাকি ? আমি তো কিছু জানিনা।'

'তুমি তো ওর সঙ্গে ধান আনতে গিয়েছিলে ভাই। তোমার সামনে মাথাটা ফাটিয়ে দিল লাঠি মেরে, তুমি বলছ কিছুই জানি না ?'

দীনু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়েছে ? গাছ থেকে পড়ে গেছে শুনলাম তো।'

'লাঠি মেরেছে।'

'কি জানি, আমি জানি না। আমি আগে চলে এয়েছিনু।'

জানে না। দীনু কিছুই জানে না। কিছু দেখা বা জানা দূরে থাক, ঘটনার সময় সে ধারে কাছেও ছিল না।

হানিফের বয়স দীনুর চেয়ে কম, বেশ শক্তিশালী শক্ত চেহারা। সে দীনুর মত ভাণ করল না, মাটির দিকে চেয়ে সোজাসুজি জবাব দিল, 'আমি এ ব্যাপারের কিছু জানি না বাবু।'

'কিন্তু হানিফ—'

'আমি কিছু জানি না।'

'আমার সাথে এসো দিকি একটু।'

হানিফকে সঙ্গে করে দীনুর কাছে নিয়ে গিয়ে, নরেন প্রায় দশমিনিট একটানা কথা বলে যায়। খুব আবেগের সঙ্গেই সে দু'জনকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, তাদের এই অন্যায়কে মেনে নেবার ভীরুতা তাদের পক্ষেই কত মারাত্মক,—যদি তারা শক্ত না হয়, প্রতিবাদ না করে, কাল জগার মাথায় লাঠি মেরেছে আরেকদিন তাদের মাথায় মারবে।

সে চুপ করলে দীনু আর হানিফ কয়েকবার ঢোক গেলে, কিন্তু বলে সেই এক কথা—তারা কিছু জানে না।

ফেরার পথে নরেন আর মণ্টু দুজনেই চুপ করে থাকে। মণ্টুর মন খুব খারাপ। মুখে সেটা ফুটেছে বেশ স্পষ্ট ভাবেই। নরেনের মুখ গম্ভীর।

হাঙ্গামা থেকে সরে থাকতে চায়, গা বাঁচাতে চায়। একি শুধুই ভীরুতা?

এগিয়ে গিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে না চাওয়ার ভীরুতা আছে এক রকম—নিন্দ করলেও অবস্থা বিবেচনা করে সে ভীরুতাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এ যে নিজের ভীরুতা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদকে পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা!

খানিক বেলায় বংশী আবার জগার খবর নিতে এলে, নরেন তার প্রাণের আপশোষটা প্রকাশ করে বলে, 'ওরা এমন ভীরু! ছিছি!'

বংশী বলে, 'ভীরু? হ্যাঁ, এক হিসাবে ভীরু বৈ-কি! কিন্তু ছিছি করাব মত সেরকম ভীরু নয়। কারণ আসলে ওরা ভীরুই নয়। অবস্থা ওদের ভীরু করেছে। সেটা স্বাভাবিক।'

নরেন তার কথাটা বুঝতে পারে না। মানুষ ভীরু হোক কিম্বা সাহসী হোক, চিরদিন অবস্থার জন্যই হয়। কিন্তু ভীরুতা ভীরুতাই—ভীরুকে ছি ছি করা যাবে না কোন যুক্তিতে?

'যে জন্যই হোক, এরকম ভীরুতা নিন্দার কথা।'

'ভীরুতা নিন্দার কথা বৈ-কি! কিন্তু এরা সত্যি ভীরু নয়। সাহসী কি মানুষ অকারণে হয়, মিছিমিছি হয়? এমনি-এমনি প্রাণ দিয়ে কেউ বীরত্ব দেখায়? অন্যায়

অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে যদি কোন লাভের ভরসাই না থাকে, বরং আরও বেশী ঘায়েল হবার ভয় থাকে, কেন লোকে তা দাঁড়াবে? ওরা একা বলেই নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে করে।'

'কিন্তু ওরা কি জানে না সবাই মিলে এক হলে—'

'জানে। কিন্তু ও জানার কোন মানে নেই। এক হলে হয় বটে, কিন্তু সব কাজের বেলা এক যে সবাই হবে তার প্রমাণ কি? একবার যদি টের পায় সবাই মিলবে, শেষ পর্য্যন্ত কিছু করতে পারবে, তখন বিশ্বাস আসে, মনে জোর পায়। তখন এদের দেখলে আপনিও বুঝবেন আজ যাদের ভীরু ভাবছেন তারা কত সাহসী।'

নরেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যই যদি এক না হতে পারে, কিসে এক হবে?'

তার রাগ দেখে বংশী বলে, 'আপনার বয়স কম, গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষদের ভাল করে জানেন না—ব্যাপারটা তাই ধারণা করতে পারছেন না। জগার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—ওরা দেখেও বলছে দ্যাখে নি। আপনি এর মধ্যে দেখছেন ভীরুতা। আসলে এটা কিন্তু ওদের সাধারণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। সাক্ষী কেবল ওরা দু'জন। গাঁয়ের লোক জগার ব্যাপারটা কিভাবে নেবে, না জেনে কি করে ওরা সেটা প্রকাশ করে? সবাই যদি এক জোট না হয়? ওরা জগার মাথায় লাঠি মারার কথা বলে বেড়াচ্ছে জানলেই শিবরাম ওদের নিকেশ করে দেবে। তার চেয়ে এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।'

নরেন চুপ করে থাকে।

বংশী বলে 'বনের কাছের গাঁয়ের লোকেদের মাঝেমাঝে বাঘের অনাচার সইতে হয়। কেউ একা বাঘের সামনে পড়লে বীরত্ব দেখাতে বাঘ মারতে তেড়ে যায় না, সটান প্রাণ নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু বাঘ মশায় সবার পক্ষেই জ্যান্ত বিপদ। কার কখন ঘাড় ভাঙবে, ছেলেমেয়ে চিবিয়ে খাবে, গরু মারবে ঠিক নেই। বাঘটাকে মারতে তখন গাঁয়ের লোক দল বাঁধে—দা কুড়ুল, লাঠি বর্শা নিয়ে সবাই মিলে

ঠেঙিয়েই বাঘের দফা নিকেশ করে দেয়।—বাঘের হাতেও হয় তো দু'একজন জখম হয়, মারা পড়ে।'

বংশীর সহজ উপমার মানে বুঝতে নরেনের কষ্ট হয় না, কিন্তু আসল কথাটা স্পষ্ট হয় না তার কাছে।

'কারো প্রাণ যাবে, কেউ জখম হবে জেনেও ওরা বাঘ মারতে এক হয়ে এগিয়ে যায় কারণ আগেও ওরা এমনি ভাবে এক হয়েছে, বাঘ মরেছে। সবাই জানে যে, বাঘ মারতে সবাই এক জোট হবে। যে গাঁয়ে কোনদিন বাঘ আসেনি, সেখানে একটা বাঘ নিয়ে ছেড়ে দিন, দেখবেন কী কাণ্ড হয়। অনেক লোক সাবাড় হয়ে যাবে—সবাই মিলে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করতে দেরী হয়ে যাবে। আগে কখনো তো সবাই মিলে বাঘ মেরে সবাই বাঁচে নি!'

নরেনের খটকা দূর হয় না। সে প্রশ্ন করে, 'কিন্তু ওরা যদি না বলে যে লাঠি মারতে দেখেছে, সবাই একজোট হবে কি নিয়ে? অন্যায়টা কি হয়েছে লোকের জানা চাই তো?'

বংশী একটু হেসে বলে, 'আপনি গাঁয়ের লোকের ধাত জানেন না। রাগে আপনার গা জ্বালা করছে, আপনি চাইছেন এখুনি প্রতিকার হোক গাঁয়ের লোকের অত অস্থির হলে চলে না। লোকে কি করে জানবে বলছেন? জগার হুঁশ হলে ওর কাছ থেকেই জানবে।'

তা বটে, এটা নরেনের খেয়াল ছিল না।

বংশী আবার বলে, 'এটা কেউ চুপ চাপ সইবে না। কিন্তু হৈ চৈ করার আগে জগার হুঁশটা ফেরা দরকার। ধরুন, এদিকে খুব হৈ চৈ বাধিয়ে দেওয়া গেল—হুঁশ হবার পর কোন কারণে জগা নিজেই বলল ও গাছ থেকেই পড়ে গিয়েছিল, কেউ ওকে লাঠি মারে নি। তখন কি ব্যাপার দাঁড়াবে?'

'লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল, তবু বলবে লাঠি মারে নি? তাই কি কেউ কখনো বলে?'

'বলে বৈ-কি। তেমন কারণ থাকলে বাধ্য হয়েই বলে। ভীম সাহাকে শিবরামের লোক পিটিয়ে প্রায় লাশ করে দিয়েছিল। তিন দিন বেহুঁশ হয়ে ছিল। হুঁশ হতে সে নিজেই বলল যে শিবরামের লোক তাকে মারে নি, ভিন্ গাঁয়ের অচেনা লোক মেরেছে। শিবরাম ওর বৌকে চিকিৎসা করানোর ছুতোয় কিছু টাকা দিয়ে শাসিয়ে দিয়েছিল, চুপচাপ না থাকলে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। খেতে পরতে পায় না, ভীম তাই সহজ যুক্তি খাটিয়ে হিসেব করল, মার যা খেয়েছে তা হজম হয়ে গেছে, গোলমাল করে লাভ কি ?'

বংশীর কথাগুলি নরেনের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। এত সহজ মনে হয় কথাটা, অথচ এতদিন সত্যাই এটা তার একেবারেই জানা ছিল না। দীনু আর হানিফকে একেবারে অমানুষ ভাবতে গিয়ে ভিতরটা তার অস্থির হয়ে উঠছিল। এখন সে ভাবে, সত্যাই তো, কারণ না থাকলে কেন মানুষ ভীরু হবে? সাহসী হবে ?

এক বিষয়ে ভীরুতা দেখালেই যে মানুষ সব বিষয়ে ভীরু হবে তারই বা কী মানে আছে ?

সে প্রশ্ন করে, 'গায়ের লোক এক হয়ে জগার পক্ষ নিলে দীনু আর হানিফও মুখ খুলবে বলছেন—সাক্ষী দেবে বলছেন ?'

'নিশ্চয় দেবে। আর কেউ যদি ঘটনাটা দেখে থাকে সে-ও তখন নিজে থেকে এগিয়ে আসবে।'

'যদি ভয় পায় ?'

'ভয় পাবে—কিন্তু শিবরামকে নয়, গাঁয়ের লোককে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে তো জানে, ওরা যে হাজির ছিল, ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে—এটা গায়ের লোকের অজানা নয়। তখন সত্যি কথা না বলা মানেই গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে যাওয়া। সে সাহস ওদের হবে না।'

জগার ভাল করে জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত গাঁয়ের চাষী সমাজ, ছেলের দল

আর ভদ্রলোকের মোটা অংশ, সত্যই যেন একেবারে উদাসীন হয়ে ছিল, ভাগের ধানের সামান্য ভাগ চাইতে যাওয়ার অপরাধে জগার মাথায় লাঠি পড়া সম্পর্কে।

কিন্তু রাগ যে গুমরে গুমরে বাড়ছিল সকলের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবী করে আওয়াজ তোলা মাত্র যে রকম সাড়া পাওয়া গেল তারই মধ্যে।

শুধু দীনু আর হানিফ নয় আরও দু'জন সাক্ষী নিজে থেকে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল—তারা স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে।

সারা গাঁয়ে আগুন জ্বলে উঠতে চায়, পুড়িয়ে দিতে চায় শিবরাম আর তার ভাড়াটে গুণ্ডাগুলিকে—বংশী এবং আরও কয়েকজন প্রাণপণে সে আগুনকে ঠেকিয়ে রাখে।

বলে যে, না, আমাদের সাক্ষীসাবুদ আছে শক্ত প্রমাণ আছে—যারা আইনের বড়াই করে তাদের কাছেই আমরা বিচার আদায় করব।

তবু হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না।

জন পনের চাষী শিবরামের ধানের গোলা পাহারা দিচ্ছিল—দুপুর রাতে শিবরামের লোকেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন জখম হয়, মারা যায় ভাগ চাষী নন্দ কামার।

তারপর আর হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না। শিবরাম হাঙ্গামা চাইছিল, তার আশা পূর্ণ হয়।

গাঁয়ে বসে পুলিশের ছাউনি। আরও অনেকের সঙ্গে নরেনও হাজতে চালান যায়।

নরেন হাঙ্গামায় কোন অংশ গ্রহণ করে নি। উচিত নয় বলেই গ্রহণ করে নি। সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে গড়ে উঠছিল, ঘটে চলছিল যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সে ভাল করে বুঝে উঠতে পারছিল না, কিসে কি হয় কেন হয়

এ অবস্থায় চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা নেওয়াই ভাল। বাহাদুরী করতে গিয়ে কি ভুল করে বসবে কে জানে—হয়তো ভাল করতে চেয়ে মন্দই করে বসবে গাঁয়ের লোকের।

তবু তাকে হাজতে যেতে হয়। সহর থেকে এসেছে, সে-ই উস্কানি দিয়ে গাঁয়ে হাঙ্গামা ঘটিয়েছে কিনা কে জানে। তার সেই ভিন গাঁয়ের মেশোমশায়ের চেষ্টায় দু'দিন পরে সে ছাড়া পায়।

৭

একমাসের বেশী সময় দেশ গাঁ ঘুরে নরেন ফিরে এল। মাত্র দশটা টাকা সম্বল নিয়ে।

সে গ্রাম ঘুরতে যাবে কেউ জানত না।

কেউ জানত না তার বাবার চোদ্দ পুরুষের ভিটেটা যে গাঁয়ে ছিল সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, নিজের জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে আর বুঝে উঠতে সে কেন মানুষ হয়ে জন্মেছে

এত বড় বড় মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে, আজও জন্মাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তুচ্ছ মানুষ সেও কেন জন্মাচ্ছে।

সহরের কোন রকমে পেটচলা চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়ে সে ছিটকে যায় গ্রামে, কাজ খুঁজতে, জীবনটার মানে খুঁজতে। নতুন স্কুলে কাজের চেষ্টা, অন্য কোন রকম জীবিকার উপায় খুঁজে বার করা, এসব ছিল উপলক্ষ।

ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য শুধু দশটা টাকা নিয়ে একমাস সে বাড়ীর রেশনের অন্নে ভাগ বসায় নি, অন্তত একটা পরিস্কার জামা একটা ধুতি ছাড়া চাকরীর খোঁজে বেরোনো যায় না, এ সব পুরাণো চাল চালে নি,—তবু নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেই তাকে বাড়ী ফিরতে দেখে কেউ খুসী হয় না। ঝগড়া করে

অতখানি তেজ দেখিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে, একটা আশা সকলের মধ্যে জেগেছিল যে, তবে হয় তো সে নিশ্চিত কিছুর সন্ধান পেয়েছে—নইলে এত তেজ দেখায়!

মুখ বাঁকিয়ে তারিণী বলে, 'হ্যাঁ, ও আবার চাকরী জোটাবে!'

কিন্তু দেখা যায় নরেনের তেজ মোটেই কমে নি।

সে বলে, 'আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, চাকরীর খোঁজে যাই নি। বাড়ীতে থাকবার জন্য ফিরিনি, চলে যাব বলেই এসেছি। থাকবার একটা যায়গা খুঁজে নিয়েই চলে যাব।'

তেজ তো দেখায় মানুষ. এটুকু তেজ না দেখালে চলে না বলে। কিন্তু কি সম্বল করে যাবে? দশটা টাকা নিয়ে এক মাসের বেশী দেশে গাঁয়ে কাটিয়ে এল, হাতে তো পয়সা কড়ি কিছুই নেই।

বাড়ীতে থাকতে হওয়ার অপমানে প্রাণটা জলে পুড়ে যায় নরেনের। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু হল?'

'কিসের কি হল?'

'চাকরী-বাকরী কাজ-কর্ম্মের?'

'হ্যাঁ, একটা বাগিয়ে এসেছি।'

'বটে বটে! বাহাদুর ছেলে তো। মাইনে কত?'

'যা আশা করে গিয়েছিলাম তার ডবল হবে।'

শুনে সুন্দরের বাবা সুরেন গোঁসাই বলে, 'আমার ছেলেটার জন্য কিছু করে দিতে পার না ভাই?'

'চেষ্টা করব বৈ-কি! ওকে একবার আসতে বলবেন আমার কাছে। তবে কি জানেন—'

মুখটা বাঁকিয়ে রাখে নরেন।

বুড়ো সুরেন বলে, 'কি বলছ?'

'দিনকাল বোঝেন তো? চাকরী বাগাতে হলে কিছু ঢালতে হয়!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়! খোঁজে কিছু আছে নাকি?'

'আছে একটা। মাইনে বেশী নয়। শ'খানেকের মত হবে।'

'তুমি ওটা বাগিয়ে দাও বাবা, সারাজীবন তোমার জয় গাইব। কত ঢালতে হবে?'

নরেন উদাসীনের মত বলে, 'ঢালতে হয় অনেক, তবে আপনার ছেলের বেলা কমেই চেষ্টা করব। গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওকে কাল পাঠিয়ে দেবেন। এ সব কথা কেউ যেন না টের পায়—সাবধান!'

সকাল বেলাই সুন্দর আসে।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের হাত ছ'য়েক লম্বা যুবক।

কালো কুচকুচে গায়ের রং।

'বাবা পাঠালেন।'

'টাকা এনেছ?'

'এনেছি। কিন্তু—'

নরেনের কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল, বুক ধড়ফড়ও করছিল।

'একটা ফর্ম দিচ্ছি—ফিল-আপ করে দিয়ে যাও। চাকরীটা তোমার হয়ে যাবে।'

সুন্দর ফর্মটার জন্য হাত বাড়ায় না।

'আমি কিন্তু দুবার দু'জনকে টাকা দিয়েছি—চাকরী পাই নি। একবার পঞ্চাশ টাকা, আর একবার দেড়শ' টাকা। বাবা তবু বললেন যে আপনি তো আর—'

নরেন বোমার মত ফেটে পড়ে, 'আমায় জুয়াচোর ঠাউরেছ? ঠক পেয়েছ? যাও, বেরিয়ে যাও তোমার টাকা নিয়ে!'

তার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে সুন্দর যেন পালিয়ে যায়।

নরেন নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে। মাসখানেক কামায় নি, চুল বড়

হয়ে গেছে। নিজের চুলের মুঠি ধরে নিজেকে নরেন বলে, 'জানিস্ পারবি না, তবু কেন চেষ্টা করিস্? এসব তোর ধাতে নেই!'

বোমার মত ফেটে না পড়ে একটু ধৈর্য্য ধরলে, একটু গম্ভীর ও উদাসীনের মত কথা বললে, টাকা যে সে নিজের জন্য নিচ্ছে না এটা একটু বুঝিয়ে দিলে, মনে সন্দেহ নিয়েও বুক ঠুকে আরেকবার ঠকবার জন্য, বেকার সুন্দর রাজী হয়ে যেত বৈ-কি। কিন্তু ওরকম বুক ধড়ফড় আর কান ঝাঁ ঝাঁ করলে কেউ পাঁচটা মিনিটও ধীর গম্ভীর হয়ে চাল দিতে পারে?

নিজের সমস্যাটা ভাল করে বিবেচনা করার জন্য, তলিয়ে বুঝবার জন্য, নরেন স্নান করতে যায়। শুদ্ধ হয়ে পূজা করতে বসার জন্য তারিণী খানিক আগে স্নান করে এসেছে—নরেন স্নান করতে যায় মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে নিজের ইতিকর্তব্য বিচার বিবেচনা করার জন্য।

স্নান করে কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে প্রায় পূজা করতে বসার মতই চৌকীতে সতরঞ্চির উপর জোড়াসন করে বসে।

একগুঁয়েমি করছে? ছেলেমানুষী কাঁচা বুদ্ধি আর ভাবপ্রবণতা নিয়ে এতটুকু পা নুয়ে মচকে যাবার নীতি আঁকড়ে থাকার বোকামি করছে?

কিন্তু হিসাব তো তার খুব সোজা। ভুলটা কোথায়, বোকামিটা কি করছে সে তো ধরতে পারছে না!

সে জানে কয়েকটা টাকা ধার করে যোগাড় করা যায়। কিন্তু ধার তো তাকে চাইতে হবে তাদেরই কাছে ছাঁটাই-করা বেকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে যারা একেবারে বাতিল করে নি?

টাকা ধার করলে এদের কাছেও সে বাতিল হয়ে যাবে। স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের হিসাবে জীবনটাকে প্রায় মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা চলে—মরুদ্যানের মতই এখানে ওখানে যেটুকু সরসতা আছে, সামান্য কটা টাকার জন্য তাও শুকিয়ে ফেলবে?

না, অন্য অবস্থায়, চাকরী করার সময় পাঁচ দশ টাকা ধার চাইতে ভাবতে

হয় নি—আজ কারো কাছে পাঁচটা টাকা চাওয়া হবে নিছক বোকামি, নিজেকে ঠকানো।

তাকের সাজানো বইগুলির দিকে তাকিয়ে নরেন নিঃশ্বাস ফেলে। তার কলেজের বইগুলি সযত্নে সাজানো রয়েছে—বরেনের আগামী প্রয়োজনের জন্য। এত তার কিসের নীতিজ্ঞান যে, বাপের পয়সায় কেনা বলেই দু'চার খানা বই বেচে দিয়ে উপস্থিত সমস্যা সমাধান করতে পারে না!

নরেন নিজের মনে মাথা নাড়ে। না, নীতিজ্ঞান নয়। বই বেচে ক'টা টাকা! বেচে দেবার কোন মানে হয় না—একটু নরম হয়ে নত হয়ে চাইলে তারিণী তাকে পাঁচ দশটা টাকা দেবে।

নিজের তেজ বজায় রাখার জন্য ওভাবে না চেয়ে তারিণীর টাকায় কেনা বই চুপিচুপি বেচে দেওয়া হবে উৎকট কুৎসিৎ ভণ্ডামি।

বই-এর তাকের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ নরেনের মুখে একটু হাসি ফোটে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছে প্রাইজ পাওয়া বই আব মেডেলের কথা!

উপার্জন কবা নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে সে ক'টা টাকার ভাবনায় পাগল হতে বসেছিল।

দু'টি মেডেল আর বইগুলি বিক্রী করে বাড়ী ফিরে সে বরেনের কাছে মাধবের ছাঁটাই হবার খবর শোনে।

মাধবের মত বড় বড় ডিগ্রিওলা নামকরা আদর্শবাদী জ্ঞানী সাধক মানুষও বরখাস্ত হয়!

জ্ঞানের নেশায় মসগুল হয়ে, কলেজে তার আঁকড়ে থাকা ছেলে পড়ানো চাকরীটা থেকে।—যে চাকরীটা বজায় থাকায় নিশ্চিন্ত মনে দিল্লী থেকে ডবল মাইনের চাকরীর ডাক সে কানে তোলে নি।

ছাত্রছাত্রীর এক সভায় বক্তৃতা করে তাকে চাকরীটা খোয়াতে হল।

তার পড়ানোর কায়দা পছন্দ করবে কি করবে না, ছাত্রছাত্রীরা ভেবে পায় না। কর্তা ব্যক্তিদের অবশ্য ভাবতে হয় না, তারা সোজাসুজি তার পড়ানো অপছন্দ করে।

পাশের পড়া পড়াতে পড়াতে, পাশ কাটিয়ে সে মসগুল হয়ে এমনভাবে জীবন আর জগৎ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আর নতুন জীবনদর্শনের কথা বলতে থাকে, যে ছাত্র এবং কয়েকটি ছাত্রী মুগ্ধ অভিভূত হয়ে শোনে।

দু'চার জনের রোমাঞ্চও হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে যায় তাদের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা।

এভাবে এসব কথা পড়ালে তারা পরীক্ষা পাশ করবে কি করে? পরীক্ষা পাশ করার জন্যই তারা এত টাকা খরচ করে কলেজে পড়ছে, গুরুজনেরা এত কষ্টের টাকা ঢালছে।

ক্লাসে এসব কথা কেন?

মাধবের মত বিদ্বান না হোক, পরীক্ষা পাশার্থী ছাত্র ছাত্রী, তারাও কি এসব কথা অলোচনা করে না, তর্ক চালাতে চালাতে ঝগড়া করে না,—আড্ডায়, বৈঠকে, চায়ের দোকানে, সঙ্ঘে, সমিতিতে?

একবার তাদের শুধু বললেই হয় যে পাশের পড়া পড়াচ্ছি এখন, আমার কিন্তু আরও কিছু অন্য কিছু বলার আছে। শুনতে চাইলে ব্যবস্থা কর।

তারা কি ব্যবস্থা করত না?

তারা কি শুনতে চায় না পাশের পড়ার চেয়েও দামী তার বাড়তি কথা?

ছাত্র ছাত্রীরা পরামর্শ করে তাকে তার বাড়তি বক্তব্য বলবার একটা ব্যবস্থা করে। শুধু তার ক্লাশের বা কলেজের নয় সব ছাত্রছাত্রীই শুনবে। কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, সভার আয়োজন করে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আগেও অনেক কষ্টে কলেজের বাইরে তারা আয়োজন করেছে, এমন একটি ক্লাশে যেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা, যে ভাবে ইচ্ছা, প্রাণ খুলে সে তার প্রাণের কথা বলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকে নিয়েই যাওয়া যায় নি এরকম কত ক্লাশে!

প্রস্তাব শুনেই অবশ্য খুসী হয়ে বলেছে, 'যাব যাব—নিশ্চয় যাব। আমি নিজেই যাব।'

কিন্তু বাড়ী থেকে পথ দেখিয়ে তাকে আনতে গিয়ে সভার প্রতিনিধিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে মানসীর।

'উনি তো যেতে পারবেন না। জরুরী কাজ করছেন।'

এবার কলেজের বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সভা ডেকে তারা মাধবকে করেছে প্রধান বক্তা। কলেজের সভা? নববর্ষ উপলক্ষে? যাবে যাবে মাধব নিশ্চয় যাবে।

কিন্তু এবারও সেই একই ব্যাপার ঘটে! মানসী জানায় মাধব যেতে পারবে না। শুনে রমেন একেবারে থ বনে যায়।'

'যাবেন বলেছিলেন, সবাই এসে গেছে, ওঁর নাম ছাপিয়ে দিয়েছি—।'

'কি করা যায় বল ভাই? বুঝতেই পারছ ইনি সেরকম মানুষ নন। সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে নাম কুড়োলে যে আখেরে লাভ হয়—এসব মানুষ সেটা বোঝে। কিন্তু নামের চেয়ে জ্ঞান এদের কাছে বড়—নিন্দা প্রশংসার চেয়ে আদর্শটা অনেক বড়।'

মাধবের বিশ বছর বয়সী অজানা অচেনা ছাত্রটিকে বাগে পেয়ে মানসী যেন ছোটখাট একটা লেকচার ঝেড়ে দেয়!

স্বামীর স্বপক্ষেই অবশ্য দেয়।

টের পায় রাগে গন্ গন্ করছে রোগা লম্বা গলা বন্ধ কোট পরা ছেলেটা। ফর্সামুখ লাল হয়ে গেছে।

রাগ চেপে রেখে রমেন বলে, 'আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। ওঁর জন্যই আমরা এবার বিশেষভাবে আয়োজন করেছি, উনি শিক্ষার বিষয়ে বলবেন বলেছেন। অন্য কলেজেব ছেলেরা এসেছে। এখন উনি বলছেন যাবেন না;'

মানসীর নিজেরও যেন লজ্জা করে। রাগুক মাধব, সে তকে সভায় পাঠাবার চেষ্টা করে দেখবে।

এত তার ভয় ভাবনা কেন, নিজের জন্য ?

মানসী একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ধীর কণ্ঠে জোর গলায় বলে, 'পাঁচ-মিনিট বোসো তো ভাই। দেখি চেষ্টা করে মানুষটাকে তোমাদের সভায় পাঠাতে পারি কিনা।'

চারিদিকে বই ছড়ানো, কাগজপত্র ছড়ানো।

একটা প্রায় একসেরী ওজনের বইয়ের শেষের দিকের পাতায় মাধব মুখ গুঁজে আছে।

'শুনছো ?'

ভয়ে ভয়েই বলে মানসী।

আগেও কয়েকবার বিশেষ দরকারে সময় শুধু 'শুনছো' বলে ডাকা মাত্র মাধব ক্ষেপে গিয়ে তাকে প্রায় মারতে বসেছিল !

কেন মারে নি সেটা অবশ্য বিধাতার কারসাজি।

মারলে সে নিশ্চয় প্রতিশোধ নিত। মাধবকে মারত না, গট গট করে বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে। ছেলে মেয়ের মায়া কাটিয়ে যেত। স্বামীকে ছাপা বই নিয়ে মাতাল হতে দিয়ে যেত।

মায়ের পেটের বোন আছে। বড়লোকের বৌ বড় বোন, সটান তার কাছে চলে যেত।

মানসী আবার বলে, 'শুনছো ! ছেলেটি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

মাধব বলে, 'ব'লে দাওনা, আমার শরীর খারাপ, যেতে পারব না !'

'আমার একটা কথা শুনবে ?'

'গেট আউট।'

মাথায় রক্ত চড়ে যায় মানসীর, সাধ হয় খাটের ভাঙা পায়াটা কুড়িয়ে নিয়ে এক আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেয় মানুষটার মাথা। যা হবার হবে, তার পরে হবে।

কিন্তু শান্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে চেয়েছে, কি বলব ছেলেটাকে ?'

'বলে দাও, চুলোয় যাক।'

'সত্যি বলব ?'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার ? বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝিয়ে বিদেয় করে দিতে পার না ?'

মাধবী প্রাণপণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে।

'একবার গেলে পারতে না ? নিজেই বলেছিলে যাবে। সবাইকে বসিয়ে রেখে বেচারা তোমাকে নিতে এসেছে—'

'গেট আউট্। গেট আউট আই সে!'

মানসী দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে বলে, 'ইয়েস, ইয়েস, আই অ্যাম গেটিং আউট। কিন্তু ছেলেটাকে কি বলব ?'

মাধব নিজে কুঁজো থেকে গড়িয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল প্রায় মরুভূমির তৃষ্ণার্তের মত শুষে নেয়।

'আমি জানতাম তুমি এভাবে জল খাবে। এই জন্য সকাল বেলা কুঁজো ভরে জল রেখেছি। ছেলেটাকে কি বলব ? পরে তুমিই আবার আমার উপর চটে যাবে!'

মাধবের জ্ঞানের নেশা কেটে গিয়েছিল। সে বলে, 'থাক্, বলেছিলাম যখন, একবার গিয়ে ঘুরে আসি।'

মানসী স্বস্তি বোধ করে বলে, 'আমি তো তাই বলছি।'

মানসী কি জানত মাধবের সেই বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কি ফল হবে!

জানলে বোধ হয় মাধবকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে নিজেই সে ছেলেটিকে বিদায় করে দিত।

যাবে বলে থাকলেও মাধব রেগে বিরক্ত হয়ে সভায় যায়। পথে খেয়াল হয় কি বিষয়ে বলবে তাও সে ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করতে সে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আপনি নিজেই বলেছিলেন ছাত্র-জীবন আর রাজনীতি নিয়ে বলবেন ?'

'ও, হ্যাঁ।'

ছাত্রজীবন আর রাজনীতি নিয়েই মাধব বক্তৃতা করে—একেবারে যেন আগুন ছুটিয়ে দেয় সভায়। বলতে আরম্ভ করার পাঁচমিনিটের মধ্যেই টের পাওয়া যায় সে জমে গেছে এবং রেগে আছে—নিজের বক্তব্য ছাড়া বিশ্বসংসার ভুলে গেছে। মাধব নিজে কখনো রাজনীতি করে নি কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—তার থিয়োরিটা পরিষ্কার।

শিক্ষার অব্যবস্থার সঙ্গে অন্য সমস্ত অব্যবস্থার অন্যায় ও দুর্নীতির যোগাযোগগুলি দেখিয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে ওসব বজায় থাকলে শিক্ষার অব্যবস্থা কোন মতেই দূর হতে পারে না, পৃথক করে শিক্ষার ভাল ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করার অর্থ হয় না। সুতরাং ভাল শিক্ষালাভই যদি ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাজ ধরেও নেওয়া যায়—এই নীতি অনুসারে, শিক্ষার খাতিরে, ছাত্রদের কোমর বেধে সব কিছু ঠিক করার কাজে অর্থাৎ রাজনীতি করতে নেমে পড়তে হবে।

শুধু যুক্তি তর্ক নিয়মনীতিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে যদি সে বলত তাহলে এতটা সোরগোল হত না তার বক্তৃতা নিয়ে। ছাত্র জীবনেও রাজনীতি বাদ দেওয়া চলে না একথা তো কত জনেই কতভাবে বলেছে এবং বলছে। কর্তৃপক্ষ একটু ধমকধামক দিয়ে, একটু সাবধান করে দিয়েই তাকে রেহাই দিত।

কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সময় রাজনৈতিক সভাতেও এরকম গরম বক্তৃতা কম শোনা যায়। বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যখন একটা গোলমাল চলছে তখন ছাত্রছাত্রীর প্রকাশ্য সভায় এরকম বক্তৃতা করা!

তবু হয় তো ত্রুটি স্বীকার করলে, আত্মসম্মান বজায় রেখে কৌশলে 'আর করব না' বলতে পারলে তার চাকরীটা যেত না।

কর্তৃপক্ষ কথাটা তুলতেই সে গেল চটে।—'কেন? কোন কথাটা ভুল বলেছি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমি আরেকটা সভা ডেকে ভুল স্বীকার করব আমি এখন পর্যন্ত জানি, একটি কথাও আমি ভুল বলিনি।'

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাকে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হল।

মাধবের চাকরী গেছে শুনেই নরেন চমকে উঠে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভেবেছিল, কেন ?—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

তাদের মত অসংখ্য সাধারণ মানুষের বেকার থাকার ব্যবস্থটা যাদের, তাদের সঙ্গে মনের অমিল হলে মাধবকেও ঘায়েল হতে হবে বৈ কি !

এ চাকরীতে যা পেত তার ডবল বেতনে 'দল্লীর চাকরী যে নেয় না, চাকরীটা না নিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত শত্রু হয়ে দাঁড়ায়—জ্ঞানের আদর্শবাদী হলেও কর্তাব্যক্তিদেব সঙ্গে মতে না মিললে এবং সেটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলে মাধবেবও চাকবী যাবে বৈ কি !

তার যেন আনন্দ হয়। মনে স্ফূর্তি জাগে।

মাধবকে সে যেন নিজেদের দলে পেয়েছে। মাধবও যেন তাব সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে মানুষ হিসাবে।

সে ছুটে যায় মাধবের বাড়ী, গিয়ে প্রথমেই মর্মান্তিক আঘাত পায় মনে। মানসী বাড়ীতে নেই।

মাধব বেকার হয়েছে শুনেই মানসী গট গট করে সোজা তার দিদির কাছে চলে গিয়েছে !

বাচ্চা ছেলেটাকে শুধু সঙ্গে নিয়েছে।

বড় তিনজনের দায় ফেলে রেখে গিয়েছে মাধবের ঘাড়ে !

মাধব শান্তভাবেই মানসীর বিরুদ্ধে তার নালিশ প্রকাশ করে।

'কি রকম বুদ্ধি বিবেচনা একবার ভেবে দেখুন। অন্যায় করে ডিসমিস্ করেছে—আমি ফাইট করলে চাকরীটা আমার বজায় রাখতে ওরা বাধ্য হবে বুঝিয়ে বললাম যে কিছু ভেবো না, ওরা আমাকে তাড়াতে পারবে না—মাথা নীচু করে আবার ডিসমিস করার হুকুমটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। শুনে বলল কি জানেন ?'

মানসী কি বলেছিল নরেন খানিকটা অনুমান করে কিন্তু অজানীর মত চুপ করেই থাকে।

মাধব বলে, হঠাৎ মত ঝেঁঝেঁ উঠল—'দিল্লীর চাকরীটা নিলে না কেন?'—বলেই বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই বেশে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হল, কোথায় যাচ্ছ? জবাব এল, 'দিদির কাছে যাচ্ছি—দিল্লীর চাকরীটাব মত চাকরী না হলে আমায় ডাকতে যেও না।'

নরেন চুপ করে থাকে।

মানসীর দিদি অনসী যে সহরের আধুনিকতম প্রাসাদগুলিব একটাতে থাকে এটা তার জানাই ছিল।

কিন্তু দিদি তো কোনদিন আসে না, চিঠি লিখে জিজ্ঞাসাও করে না মানসী কেমন আছে!

তার কাছেই মানসী কতবার গর্ব করে বলেছে: 'জানেন? দিদি একটা পয়সাওলা মুখ্যু ব্যবসাদারের বৌ আর আমি একজন গরীব নাম-করা বিদ্বানের বৌ বলে দিদি আমায় কি রকম হিংসা করে? আমার বিয়ের পব একবার মোটে এসেছিল, ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপর আব আসে নি।'

সগর্বে মাথা উঁচু করে মানসী বলেছে, 'খোকনেব অন্নপ্রাশন হবে, নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম! আমার তো উচিত নিজের দিদিকে নেমন্তন্ন করা আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে? গিয়ে দাঁড়াতেই দিদি বলেছিল, আমি তোকে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারব না মনু। কেন এসে আমায় জ্বালাতন করিস?'

নরেন আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিল, 'একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়?'

মানসী বলেছিল, 'সামান্য ব্যাপার—তাকে কিছু হওয়া বলে না। দিদির কাছে থেকেই তো পড়তাম কলেজে? ভোলাদা' একদিন তামাসা করে আমার গালটা টিপে দিয়েছিল, দিদি দেখে ফেলেছিল। তারপরেই বোর্ডিং-এ যেতে হল,

মাধব বলা মাত্র ওর সঙ্গে আমাকে গেঁথে দেওয়া হল। দিদি আর খবরও নেয় না বেঁচে আছি কি মরে গেছি।'

মাধবের চাকরী যাবার খবর শুনেই বাচ্চা ছেলেটাকে বগলদাবা করে এক কাপড়ে মানসী চলে গিয়েছে তার সেই দিদির বাড়ীতে!

চাকরী-খোয়ানো বেকার মাধবের চেয়ে তার বড়লোক ব্যবসাদার ভগ্নীপতির বৌ ওই দিদির কাছে যাওয়াই সে শ্রেয় মনে করল?

মাথা ঘুরে যায় নরেনের।

এ অবস্থাতেও মাধবের মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে দেখে আরও যেন বেশী ঘুরে যায় তার মাথা।

মাধব বলে, 'দিদির কাছে গিয়েছে যাক, সেজন্য নয়। আমি দিল্লীর চাকরী নিলাম না, এ চাকরীটাও খুইয়ে বসলাম—এর জন্য রাগ করে গিয়েছে, সেজন্যও নয়। অন্যায় করে আমায় তাড়িয়েছে, ফাইট করে এটা আমি পাল্টে দেব—এসব কথা শুনেও চলে গেল, এটাই প্রাণে বড় লাগছে।'

প্রাণে লাগছে!

প্রাণে! মাধবের মত জ্ঞানীর প্রাণেও তবে আঘাত লাগে।

৮

কোথায় আস্তানা গাড়বে? দীননাথেরা যে বস্তিতে গিয়ে উঠেছে, নরেন সেখানে গিয়ে হাজির হয়।

খুব ভোরে যায়, দীননাথ কাজের খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে।

বলে, 'ঘরটার জন্য কত ভাড়া দাও?'

'একলা তো নয়, তিনজনে থাকি, ভাগাভাগি করে দিই।'

'চার জনের যায়গা হয় না? ভাড়াটা আরও ভাগাভাগি হয়ে যেত?'

'কষ্ট হবে—এত গাদাগাদি অভ্যাস নেই আপনার।'

'কিছু কষ্ট করতেই হবে। আমাকে আর আপনি ফেলো না দীননাথ—তোমাদের দলেই ভিড়ে গেছি।'

বস্তির ঘরের ভাগাভাগির ভাড়াটাও আগাম দিতে হয়! অন্য দু'জন ভাড়াটে, লোচন আর ভূপাল ছেড়ে কথা কয় না।

কদিন এখানে কাটল।

প্রাইজের বই আর মেডেল বিক্রীর পয়সা শেষ হল।

এবার দিন কাটবে কি করে কে জানে!

সারাদিন ঘুরে শ্রান্তক্লান্ত নরেন এই কথাটাই ভাববার চেষ্টা করে!

বাইরে রোদের তেজ কমার আগেই ঘরের ভিতরটা আবছা মেরে যাচ্ছে। ঘর খোলার হলেও মদনের ঘরটাকে তবু ঘর বলা চলে, সেই ঘরের গায়ে ঢালু চালার নীচে কায়দা করে তৈরী করা এই ছোট্ট খোপরটাকে ঘর বললে হোগলার ঘরগুলিকেও অপমান করা হয়।

তবে জানালাটা পূবের বাগানের দিকে। বিকাল হতে না হতে দিনের আলো-আসা কমে যাক, সকাল বেলা জানালাটা দিয়ে বারোমাস এক ফালি রোদ তাদের এই ঘরে ঢোকে।

সূর্য চলে উত্তরে দক্ষিণে। রোদের ফালিটাও বাড়ে কমে। বছরে একটা দিনও বাদ যায় না। অল্পক্ষণের জন্য হলেও অন্তত একটুখানি রোদ তাদের খোপরে ঝিলিক মেরে যায়।

এখানে অশিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যে এসে কয়েকদিন বাস করে, এদের জীবন-যুদ্ধের নগ্ন বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে নরেনের নতুন চিন্তার খোরাক জোটা ছাড়াও একটা বড় রকম মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। শিক্ষা আর পাশ করার উপর তার যে একটা বিজাতীয় ঘৃণা আর রাগ জন্মেছিল—সেটা কেটে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শিক্ষায় বঞ্চিত মানুষ নিজেরই কত মিথ্যা ধারণা ও বিশ্বাসের কাছে ক্রীতদাসের মত বাঁধা পড়ে আছে সেটা তার নজরে পড়েছিল, কিন্তু শিক্ষার মূল্য যে কত সেটা এরকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

গ্রাম্য জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে এমন একটা সামঞ্জস্য আছে অশিক্ষিত মনগুলির বিকার ও অন্ধকারের যে শিক্ষার অভাবের কথাটা যেন বড হয়ে উঠতে পারে না, শিক্ষালাভে বঞ্চিত হবার অভিশাপটা এতখানি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় না।

শহরের এই বস্তিতে এলে ভাল করে টের পাওয়া যায় শিক্ষায় বঞ্চিত হবার সে অভিশাপ কেমন।

না, শিক্ষা খারাপ নয়। পাশ করা খারাপ নয়।

শিক্ষার ব্যবস্থায় অনেক খুঁত আছে বলে, পাশ করে বেকারি বরণ করতে হয় বলে গায়ের জ্বালায় চোখ কাণ বুঝে পড়াশোনা আর পাশ করার উপর চটে যাওয়া উচিত নয়!

এদিক দিয়ে নরেন সত্যই পরম স্বস্তি বোধ করে। শিক্ষা আর সভ্যতার বিরুদ্ধে কী জ্বালাটাই তার মধ্যে জমেছিল! সেটা জুড়িয়েছে।

বাইরে খোলা আকাশ আলো বাতাস। মানুষ আর পশু পাখীর একটানা জীবন-যাপন।

মদনের রোয়াক দিয়ে উঠান হয়ে বাইরে যাতায়াত। গোবর-লেপা সেঁতসেঁতে

সরু রোয়াকের একদিকে মদনের বৌ রান্না করে, অন্য দিকে একটা দড়ি বেঁধে ঝোলানো প্যাকিং বাক্সের দোলায় ঘুমিয়ে থাকে তার বাচ্চা ছেলেটা।

কী ঘুমটাই যে ঘুমায় দেড় বছরের বাচ্চা ছেলে! কখন জাগে, কখন ক্ষীণ কণ্ঠে একটু কাঁদে খিদেয় তেষ্টায়, নরেন যেন টেরও পায় না।

এতই কমজোরী তার কান্না।

ছোট উঠান। লম্বাটে হলেও চারকোণা। চারদিকে চারখানা ঘর তোলাই সম্ভব এবং উচিত। কী কায়দায় যে এইটুকু উঠান ঘিরে ন'খানা কুঠুরি গড়া গেছে আর তাদের চারজনকে বাদ দিয়ে সাতটি পরিবারকে ঘর ভাড়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে, নরেনের মাথায় ঢোকে না।

স্কুল থেকে কলেজের ডিগ্রির ক্লাশ পর্যন্ত জ্যামিতি বেশ ভালভাবেই হজম করেছে, মজা পেয়েছে। তাই মনে হয়—হয় এই খোলার ঘরগুলি ম্যাজিকের তামাসা, নয় ওই জ্যামিতির নিয়মগুলি মিথ্যা।

বেলায় বেলায় আঁচ পড়েছে। তিনটি উনানে। আরও দুটি উনানে আঁচ পড়বে সন্ধ্যা নাগাদ। রান্না সামান্য, রুটি পাকানো অথবা চাল আর ঘাসপাতা সিদ্ধ করা—তবু সেটা বেলায় বেলায় সারলে আলোর খরচ বাঁচে।

খোলার ঘরের এরাও টের পেয়েছে যে গত মহাযুদ্ধে তাদের মত অনেক উলুখড়ের প্রাণ দেওয়াতেই শেষ হয়ে যায়নি যুদ্ধের বিপদ, মহাযুদ্ধের আরেকটা লণ্ডভণ্ড ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাবার চেষ্টা চলেছে পুরা দমে।

টের না পেয়ে উপায় নেই। কী রেটে চড়ে কোথায় উঠেছে জীবনযাত্রায় দরকারী সব কিছুর দাম!

ডিবরি জ্বাললে যেন প্রাণটাও জ্বলে যায় সেই সঙ্গে—কি দামে কেনা তেল ডিবরিতে পুড়ছে ভেবে।

সাত ঘর ভাড়াটে।

ক'দিন উনান ধরছে পাঁচটি।

ড়'টি পরিবারের কি একটু আগুন জ্বেলে পিণ্ডি সিদ্ধ করে খাওয়ার দরকার ফুরিয়ে গেছে ?

তা নয়।

হারাধন আর তার বৌ মোক্ষদার এসেছে পালা জ্বর—এক সঙ্গে। নরেন খবর নিতে গিয়ে দেখেছিল হারাধনের আরাম করে শোয়ার বাঁশ আর নারকেল দড়ির খাটিয়াটা খালি পড়ে আছে। সংগ্রহ করা ইট আর কাঠের তক্তা দিয়ে মোক্ষদার তৈরী খাটে পুরাণো ছেঁড়া তোষকের বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে জড়াজড়ি করে ড়'জনে পালা জ্বরের শীতে কাঁপছে !

ছেলেমেয়ে নেই তাই রক্ষা।

দক্ষিণের চালাটার পূবের দিকের খোপরে থাকে সাবিত্রী। সীঁথিতে সিঁদুর দেয়, কে স্বামী কোথায় থাকে, কেউ জানে না। তিনটি ছেলে মেয়ে—বড় মেয়েটির বয়স বছর আষ্টেক, ছোটটির চার। মাঝেরটি ছেলে।

দিন চারেক কোন পাত্তা নেই সাবিত্রীর।

তার উনানটাতেও আঁচ পড়ে না।

শিখা, বলাই আর চাঁপা চালিয়ে যাচ্ছে অরন্ধনের পালা। নিজেদের চেষ্টায় বেঁচে থাকার লড়াই।

নেতৃত্ব শিখার।

চেয়ে, কুড়িয়ে, চুরি করে কি ভাবে তারা তিনজন দিন চালাচ্ছে খুঁটিনাটি না জানলেও নরেন মোটামুটি আঁচ করতে পারে।

কাল থেকে শানাই বাজছে গজেন সরকারের বাড়ীতে। মানুষ গিজ গিজ করছে। এলোপাথারি হৈ চৈ ছুটোছুটি আদর আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব চলছে প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে।

শিখার নেতৃত্বে তিনজন বিয়ের রাত্রে ওই বাড়ীতে পাতা পেড়ে ভোজ খেয়ে এসেছে।

নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেনি! মেরেধরে দূর দূর করে কুকুর-বেড়ালের মত তাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করে নি।

রীতিমত মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করে এটা সম্ভব করেছে।

নরেন গিয়েছিল বিধুর দোকানে চিড়ে কিনতে। শিখা গিয়েছিল ধারে চার পয়সার এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান জোগাড় করতে। চার পয়সার এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান ধারে পাওয়ার জন্য সে কি লড়াই বুড়ো দোকানী বিধুর সঙ্গে ছেলেমানুষ মেয়েটার!

বিধু কিছুতেই ধারে তাকে চার পয়সাব সাবান দেবে না, শিখাও ধারে সাবানের টুকবোটি না বাগিয়ে ছাড়বে না।

'বাবা নয় তো মা বাড়ী এলেই তুমি তোমার সাবানের দাম পাবে। বলছি তো পাবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কত পাব তা জানাই আছে। যা যা ভাগ্।'

ভাগ্ ভাগ্ করে তাড়িয়ে দিলেও শিখা এক ইঞ্চি পিছু ভাগে নি। আলুর বস্তার উপর আরও খানিক উপুর হয়ে সামনে ঝুঁকে সে বলেছে, 'চার পয়সাব সাবান ধারে দেবে না তো বিধু কাকা? বামুনের বাড়ী বিয়ে। বামুনের মেয়ে নেমন্তন্নো রাখতে যাব। একটু সাফ করা চাই তো জামা কাপড়টা? কেন মিছে বামুনের মেয়ের অভিশাপ খাবে চার পয়সাব সাবানের জন্যে। মা-বাবা একজন ফিরে এলেই দাম ঠিক পাবে।'

বিধু সাড়ে পাঁচ আনা দামের বিদেশী কোম্পানীর কাপড় কাচা সাবানটা শিখার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, 'নে বাছা, নে। তোর বাপ যে বামুন, তুই যে বামুনের মেয়ে, তোর বাপ সেটা খেয়াল রাখতে দেয়? চাঁড়ালেব অধম চালচলন হয়েছে তোর বাপের'

শিখা সাবানটা ফেরত দিয়ে বলেছিল, 'এত দামী সাবান চাই নি তো। চার পয়সার একটা কাপড়কাচা সাবান দাও।'

কত হিসাব এতটুকু মেয়ের! চার পয়সার সাবানে যে কাজ চলে সেজন্য

সাড়ে পাঁচ আনার সাবান ধারে নেওয়াও বোকামি, শুধু এ হিসাবে নয়। সাবানটা নিয়ে অন্য দোকানে ফেরত দেবার ছলে পুরো দাম আদায় করা কিম্বা চার ছ'পয়স কমে কারো কাছে বিক্রী করার কায়দায় কয়েক আনা লাভ করাও যে বোকামি—এ হিসাবও শিখা জানে!

সেই সাবানে শিখা সাফ করেছিল তার নিজের একটা না-শাড়ী না-ধুতি কাপড আর ভাই বোনের ছেঁড়া জামা।

চার পয়সার সাবানে সাফ করা পোষাক পরে তারা তিনজনে প্রকাণ্ড তিনতলা ইটের প্রাসাদ-বাড়ীতে বিয়ের ভোজের সারি বেঁধে পাতা আসনের তিনটি আসন দখল করে ভোজ খেয়ে এসেছে!

সে কি খাবে? অতটুকু মেয়ে ব্যবস্থা করে নিজে ভোজ খেয়ে এসেছে, ভাইবোনদের ভোজ খাইয়েছে—এত বড যোয়ান মদ্দ গ্র্যাজুয়েট মানুষটা সে ভেবে পাচ্ছে না উপোস ঠেকানোর উপায়!

মাধবের বইটার দিকে চোখ পড়ে।

মাধবেরও চাকরী নেই শুনে সেদিন দেখা করতে গিয়ে সে এই বইটা এনেছিল। এ অবস্থাতেও সে বই পড়তে চায়। পেটের খিদেয় চোখের সামনে অক্ষর ঝাপসা হয়ে আসে—তবু বই পড়ার নেশা যেন কাটতে চায় না।

কিন্তু শেষ করতে পারে নি বইটা।

নেশা আছে—খিদেয় ঝিমিয়ে গেছে নেশাটা।

বইটা পুরাণো বই-এর দোকানে বিক্রী করে দিলে উপস্থিত সমস্যার সমাধান হয়।

মাধবের অনেক বই আছে, তার হয় তো খেয়ালও নেই তাকে বই দিয়েছে কি দেয় নি।

মোটা বই, দামী বই। দুটো তিনটে টাকাও কি পাওয়া যাবে না ওটা বই-এর পুরাণো বাজারে বিক্রী করে?

বই হাতে করে নরেন বেরিয়ে যায়।

ভিতরে যেন উথলে উথলে উঠতে চায় প্রতিবাদের ঢেউ,—একেবারে হৃদয়ের ভিতরে

কষ্ট জীবনে কম পায় নি। কিন্তু ছ্যাচরামি করে নি কোনদিন।

নিরুপায় হয়ে আজ তাই করবে?

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বুকশপের সামনে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নরেন নিজের মনেই কয়েকবার মাথা নেড়ে জ্বালাভরা হাসি হাসে। তারপর সোজা মাধবের বাড়ীতে চলে যায়।

বলে, 'শেষ হয় নি, তবু ফিরিয়ে দিতে এলাম বইটা।'

'কেন? ক'দিন পরেই দেবেন।'

নরেন ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে, 'না। দোহাই আপনার, আমাকে আর বই দেবেন না। এ রকম বিপদে ফেলবেন না। পেটের জ্বালায় বইটা বিক্রী করে দিতে যাচ্ছিলাম! কাছে থাকলে হয় তো সামলাতে পারব না, ফেরত দেওয়াই ভাল।'

মাধব খানিকক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব আজ বই পড়ছিল না। গেয়ের জ্বর হয়েছে—তার কপালে জলপটি দিচ্ছিল।

জলপটি! আইস ব্যাগ নয়।

কদিনে চেহারা পর্যন্ত যেন অন্যরকম হয়ে গেছে মাধবের।

'যদি অপমান মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।'

'টাকা ধার নেব না কিন্তু। ওতে কোন লাভ নেই—শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। মাঝখান থেকে ঢিলেমি আসে।'

মাধব সহজ ভাবেই বলে, 'টাকা ধার দেবার অফার নয়। একটা টেম্পোরারি কাজের কথা বলছিলাম।'

'কাজ করে পয়সা পাওয়ার জন্ত ওৎ পেতে আছি। যে কোন কাজের অফার দিন, কিছুমাত্র অপমান বোধ করব না।'

'কাজ করে পয়সা রোজগারের কথাই বলছি। আমার নিজের কাজ কিনা, তাই বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। অ্যাদ্দিন খেটে খুটে যে বইটা লিখছিলাম, ওটা ছাপতে দেব ঠিক করেছি। ম্যানাসক্রিপ্ট রেডি কিন্তু বড্ড বেশী কাটাকুটি হিজিবিজি হয়ে আছে,—একটা ফেয়ার কপি করে প্রেসে দিতে হবে।'

মাধব একটু থামে। নরেন চুপ করে থাকে।

'দেখছেন তো কিরকম ঝনঝাটে আছি—ওদিকে চাকরীর ব্যাপার, এদিকে ছেলে মেয়ের ঝন্‌ঝাট। তাছাড়া, ওসব কপি করার কাজ আমার একদম আসে না। আপনি ওটা নিয়ে গিয়ে যদি কপি করে দেন, প্রেসে দেবার পর প্রুফটাও দেখে দেন—'

নরেনের মুখ দেখে মাধব জোর দিয়ে বলে, 'কাজ করে বন্ধুর কাছে টাকা নিতে কোন অপমান নেই। আপনি না করলে আমি আরেকজনকে দিয়ে করাব—টাকা আমাকে দিতেই হবে।'

নরেন বলে, 'অপমান নয়। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। নিজে বইটা ছাপাবেন? কোন পাবলিশার পেলেন না? পাবলিশারকে দিয়ে দিলেই তো ঝন্‌ঝাট চুকে যেত।'

'কোথায় আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াব? নিজেই ছাপছি।'

'সে কথাটাই ভাবছিলাম। আপনাদের মত লোকের কাছে পাবলিশাররা আসে না কেন? আপনার ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট তৈরী আছে জানা থাক বা না থাক, তাগিদ দিয়ে আপনাদের দিয়ে বই লেখায় না কেন?'

তাদের কি গরজ?'

'গরজ বৈকি—বই প্রকাশ করাই তাদের ব্যবসা। ভাল বই হলে তাদেরও লাভ। ওদের এটুকু খেয়াল হয় না যে আপনাদের মত যারা দামী বই লিখতে পারেন তাদের আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াবার ঝন্‌ঝাট পোষায়

না? এরকম অনেকে আছেন, জীবনে শুধু বই পড়ে জ্ঞানের চর্চাই করে যান—বই লেখার কথাটা মনেও আসে না। এটা সবারি লোকসান অনেক দামী কথা নতুন কথা ভেবেছেন, লিখে রেখে গেলেন না বলে আমরা পেলাম না।'

মুখে একথা বলে বটে কিন্তু মনে মনে নরেনের খটকা লাগে, সত্যই কি এটা লোকসান? জ্ঞানী ব্যাক্তিরা বই তো কিছু কম লেখে নি, লেখাতে কামাই-ও পড়ে নি,—দোকানে দোকানে রাশি রাশি বই!

তার মধ্যে বেশীব ভাগই অবশ্য পুরাণো জ্ঞানের জাবর কাটা, যা মানুষ আগেই জেনেছে সেটাই আবার অন্যভাবে বলাব চেষ্টা।

পুরাণো মোটা কথাকে সরু করে এবং সরু কথাকে মোটা করে নূতনত্ব ফলাবার চেষ্টা। জেনে শুনে সকলেই যে ফাঁকি দিয়ে নাম কবার জন্য এ রকম চেষ্টা করে তা নয়। অনেকের জানাই থাকে না যে জ্ঞানের জাবব কেটে ফাঁকিব কারবার চালাচ্ছি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে আমি নতুন কথা বললাম. মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে ধন্য হলাম!

কিন্তু মানুষের জ্ঞানেব ভাণ্ডারে জমা করার মত নতুন জ্ঞান খাঁটি জ্ঞান যদি কারও দেওয়ার থাকে, প্রকাশকদের উদ্যোগের অভাবে সেটা কেন চাপা পড়ে যায়?

তবু এত জ্ঞান কোথায় পেল মানুষ, এতদূব এগোল কি করে?

কার্ল মার্কসকে দেশ থেকে দূর করে দিলেও কি তার নতুন জ্ঞানেব প্রচার এবং প্রসার প্রকাশকের অভাবে চাপা পড়ে গেছে?

বিদেশে দারিদ্র্য ভোগ করেও কি সারা জগতেব স্বীকৃত পুরাণো সত্য মিথ্যার জ্ঞানকে অবলম্বন করেই নতুন আলোকে নতুন সত্য মিথ্যার জ্ঞান সৃষ্টি করে সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া ঠেকে থেকেছে?

'কি ভাবছেন?—প্রস্তাবটা পছন্দ হল না?'

'পছন্দ হয়েছে বৈকি। কাপড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজ চেয়ে

পাই নি—আপনি তো আমায় যেচে মস্ত সম্মান দিলেন, আমার বিদ্যাকে মূল্য দিলেন।'

মাধব ভারি খুশী হয়।

একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়ে বলে, 'শুনে আপনি হয় তো চমকে যাবেন, তবু আপনাকে বলি। মানসীর ব্যবহারে আমার যত রাগ দুঃখ জ্বালা হয়েছিল, সব প্রায় মিলিয়ে গেছে। ও যদি এরকম ব্যবহার না করত, আমাকে এরকম বিশ্রী অবস্থায় ফেলে চলে না যেত—আমি বোধহয় কোনদিন টেরও পেতাম না কি রকম ফাঁকা জ্ঞান নিয়ে মেতে আছি।'

নরেন উৎসুক ও উৎসাহিত হয়ে বলে, 'আমায় কিছু খেতে দিয়ে তারপর বলুন। খিদেটা জুড়োলে আপনার কথা ভাল বুঝতে পারব। আমি অন্যভাবে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।'

মাধব মিষ্টি স্বরে ডাকে, 'শুভা? একটু শুনে যাও?'

বাইশ তেইশ বছরের একটি রোগা ছিপছিপে শ্যামবর্ণা মেয়ে ঘরে এসে বলে, 'কি কন?'

ম্লান বিষণ্ন মুখ। ধীরতা স্থিরতার যেন প্রতিমূর্তি।

মাধব কেন ডেকেছে, সে কি বলবে শোনার জন্যই যেন সে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে—আর কিছুই সে দেখবে না, কিছুই সে শুনবে না—তার কোন কৌতূহল নেই, কোন সাধ নেই।

মাধব যেন আবেদনের স্বরে বলে, 'এঁকে কিছু খেতে দিতে পার? বাড়ীতে কিছু আছে, না আনতে হবে?'

'আছে।'

সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে সুস্পষ্ট পদক্ষেপে শুভা ফিরে যায়।

নরেন বলে, 'খেয়ে নিয়ে তারপর বড় কথাটা ভাল করে শুনব। খিদেয় মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে—কি বলবেন হয় তো বুঝবই না। ইনি কে?'

সে যে এ প্রশ্ন করবে সেটা তো জানাই ছিল। মাধব নিজে থেকে শুভাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও কোন দোষ হত না।

মাধব বলে, 'রাঁধুনী রাখতে হল একজন, উপায় কি ?'

'উদ্বাস্তু মেয়ে না ?'

'বোধ হয় উদ্বাস্তু।'

মাধব একনজর তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, 'আপনি নানারকম কত কি ভাববেন মনে করে একটা কথা বলব না ভেবেছিলাম। মেয়েটি সত্যি ভাল। একবার যা করতে বলা হয় সব নিখুঁতভাবে করে যায়— দু'বার বলতে হয় না। জগন্নাথবাবুকে একটা রাঁধুনীর জন্য বলেছিলাম—উনি নিজে সঙ্গে নিয়ে এসে শুভাকে দিয়ে গেলেন। জগন্নাথবাবু চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন, শুভা ছাড়ল না। বলল—'.

শুভার ভাষায় তার কথাগুলি শোনাতে পারবে কিনা মনে মনে আওড়ায় মাধব। বোধহয় হার মেনেই বলে, যাবেন না আপনি, সামনে থেকে কি কাজ করব ন' করব বোঝাপড়া করে দিন। খাওয়া দাওয়া দিবেন, দশ টাকা বেতন দিবেন যে কাজ করনের লেইগা দিবেন আমি তা করুম। বাড়তি কিছু করুম না। আমার কাজ প্রাণ দিয়া করুম।

নরেন শুকনো গলায় বলে, 'আপনি সাধক মানুষ তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি বাড়তি কাজ করার মানে বুঝেছিলেন তো ?'

'বুঝেছিলাম বৈ কি। আমাকে কি এতই বোকা ভেবেছেন ? জীবনে কোন মেয়ের কাছে বাড়তি কাজ চাইনি—কোন দিন চাইবও না।'

সতেজে একথা ঘোষণা করে সানন্দে মাধব বলে, 'কিন্তু অন্যরকম বাড়তি কাজ শুভা নিজে থেকেই করছে। যতক্ষণ ভাত ফুটছিল, ইলার মাথায় নিজেই জলপটি দিয়েছে, হাওয়া করেছে।'

নরেন বলে, 'বটে !'

মাধব নিজের মনে বলে যায়, 'আমায় ডেকে বলল, এইবার মাছ তরকারী

কাটুম ভাজুম রান্না করুম—আপনে খানিক জলপটি ভান। বরফ দিলে হইত না? আইসব্যাগ নাই? আপনাকে বলব কি ভাই, মাথাটা যেন গুলিয়ে দিল মেয়েটা। ঠিক কথা, ইলার মাথায় একটা আইসব্যাগ দিলে যে কাজ সব চেয়ে ভাল ভাবে হয়—সেই কাজ আমি সারছি মাথার জলপটি দিয়ে!'

সখেদে আবার বলে, 'একটা মুখ্যু মেয়ের যেটা খেয়ালে আসে, আমার মত মহাপুরুষ বিদ্বানের বুদ্ধিতে সেটা ধরাই পড়ে না।'

নরেন সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'দিনরাত থাকে?

মাধব বলে, 'পাগল হয়েছেন? খাওয়াপরা দশটাকা বেতনে দিনরাত থাকবে? সকালে এসে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে এগারোটার সময় খাবার নিয়ে বাড়ী চলে যায়। চারটের সময় এসে বিকালের রান্না সেরে খাবার নিয়ে বাড়ী যায়। সন্ধ্যার সময় আমি ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। রাত ন'টা দশটায় সময় এসে ছেলেমেয়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয়।'

নরেন চমৎকৃত হয়ে বলে, 'সে কি!'

নরেন ভাবছিল মানসীর কথা। সে লোক-নিন্দার কথা ভাবছে মনে করে মাধব বলে, 'লোকে কি ভাববে বলছেন তো? ভাবলে কি করব! ছেলেমেয়েগুলি একলা শুতে পারে না, ভয় পায়। সেইজন্য আমি বলেছিলাম, রাত্রে ওদের কাছে শুতে হবে। আমি নিজের কাজ করব না ওদের ভয় সামলাব?'

নরেন জোর করে কথা ঠেকিয়ে রাখে। কে জানে মানসীর উপর মাধবের এটা প্রতিশোধ কিনা!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাধব আবার জোর দিয়ে বলে, 'কথাটা খেয়াল করি নি ভাববেন না। জেনে শুনেই ওকে রাত্রে ছেলেমেয়েদের কাছে শুতে বলেছি। যার যা খুসী ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করি না। মাইনে দিয়ে রাঁধাবাড়ার জন্য, ছেলেমেয়ে দেখবার জন্য যাকে খুসী রাখব—লোকের কি? তা ছাড়া, আমার তো মনে হয় না লোকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে।'

নরেন তা জানে। দু'চার জন একটু হাসাহাসি করতে পারে, অল্পবয়সী ঝি

রাঁধুনী রেখে ভদ্রলোকের বদনাম হয় না। কিন্তু মাধব কেবল লোকের কথাই বলছে—মানসীর কথাটা কি সত্যই ওর খেয়ালে আসে নি?

ভুল বুঝে ফিরে এসে শুভার জন্যই মানসী আবার গট্ গট্ করে দিদির কাছে চলে গেলে তাকে যে দোষ দেওয়া যাবে না– এটুকু বাস্তব বুদ্ধি কি তার নেই?

অথবা সে যা ভাবছে তাই ঠিক? জেনে শুনে মাধব প্রতিশোধ নিচ্ছে মানসীর উপর?

'আমি বৌদির কথা ভাবছিলাম। মেয়েদের মন বোঝেন তো? শুভা একেবারে ঝি রাঁধুনী ক্লাশের মেয়ে হলে কথা ছিল না। বৌদি জানলে চটে যাবেন।'

মাধব উদাস ভাবে বলে, 'যাবেন। আমি তার কি করব? আমি যাকে পেয়েছি রেখেছি।'

না, প্রতিশোধ নয়। মনের তলায় যাই থাক মাধবের, জেনে বুঝে প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বিশেষ করে শুভাকে রাখে নি। মানসী কি মনে করবে এটাই সে গ্রাহ্য করে না।

মাধবের অবজ্ঞা আন্তরিক। মোটা মাইনের চাকরী যার কাছে মানুষের চেয়ে মূল্যবান তাকে অবজ্ঞা না করে মাধবের উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শুভা মামলেট ভেজে এনে দেয়।

নিঃশব্দে সেটা উদরস্থ করে একগ্লাস জল খেয়ে নরেন প্রশ্ন করে, 'এবার বলুন তো কথাটা—বৌদি চলে যাওয়ায় আপনার কি উপকার হয়েছে বলছিলেন?'

'নিজেকে চিনতে পেরেছি, আমার জ্ঞান চর্চ্চার ফাঁকিটা ধরতে পেরেছি। আমার জ্ঞান চর্চ্চা করেই সুখ—সেটা জগতের কোন উপকারে লাগল কি লাগল না সেজন্য ততটা আসে যায় না। জ্ঞানটা দিয়ে কি করব সে ভাবনা না ভেবেই পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছি।'

মাধবকে নিয়ে মানসীর সঙ্গে সেদিনের আলোচনার কথা নরেনের মনে পড়ে।

এদের রেশনটা এনে দিয়ে মাধবের বাজার করে ফেরার সময়টুকুর মধ্যেই মাধব সম্পর্কে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল—মাধব স্বার্থপর। তখন তার চাকরী ছিল।

চাকরীটা যদি আজও থাকত, মাধবের এই আত্মজ্ঞান জন্মেছে দেখে তার বোধহয় খুসীর সীমা থাকত না। কিন্তু চাকরী খুইয়ে হৃদয় মনের অনেক শিক্ষাই তার জুটেছে ইতিমধ্যে। খুসী হবার বদলে আজ তাই নানা প্রশ্ন জাগে। খটকা লাগে যে মাধব কি সত্যই বাস্তবতার আলোয় তার আত্মকেন্দ্রিকতার স্বরূপ চিনেছে? সেটাকে নিজেব স্বার্থপরতা বলে মানতে পেরেছে? অথবা ছাঁকা জ্ঞান-চর্চ্চার মতই এটাও তার ছাঁকা জ্ঞান যে জ্ঞান দিয়ে কি করবে না জেনেই সে এতদিন জ্ঞান-চর্চ্চায় মশগুল হয়ে থেকেছে?

নিজের জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়ে এই জ্ঞানটুকু নিয়েই কি সে খুসী থাকবে?

শুধু তাই নয়। আত্মদর্শনে তার ভুল আছে কিনা বিচার করবে না? মানসীর জন্যই তার নতুন আত্মজ্ঞান জন্মালো অথবা বরখাস্ত হওয়াও এর একটা মূল কারণ—সেটা যাচাই করবে না?

মাধব বলে, 'কি হল? কথাটা তো সোজা, বুঝতে পারলেন না?'

নরেন বলে, 'বুঝেছি বৈকি। কিন্তু শুধু বৌদিকে দায়ী করবেন? চাকরী খোয়ানোব হিসাবটা ধরবেন না?'

'চাকরীর হিসাব ধবেছি। মানসীই আসল কারণ। মানসী এরকম ব্যবহার না করলে আমি কি করতাম জানেন? রেগে দিল্লীতে কযেকজনেব কাছে কয়েকটা চিঠি আর একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতাম। আমার জন্যই চাকরীটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল—আমার মত অন্য কাউকে নেওয়া হযে থাকলেও আরেকটা চাকরী ক্রিয়েট করে আমায় নিত। ডিসমিসড্ হয়ে বাড়ী ফেরার সময় এই প্ল্যানটাই মাথায় ঘুরছিল।'

নরেন বলে, 'রাগ করবেন না কিন্তু। আমি শুধু বুঝতে চাইছি। বুঝিয়ে না দিলে আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যাবে। আপনি বলেছিলেন, দিল্লীর

চাকরী নেন নি, এ চাকরীটা খোয়ালেন, এজন্য বৌদি রাগ করে চলে গেলে আপনার দুঃখ হত না। কিন্তু অন্যায় করে আপনাকে তাড়িয়েছে, আপনি ফাইট করে ওদের হুকুম বাতিল করাবেন—এসব শুনেও বৌদি চলে গেলেন বলে আপনার রাগ। দিল্লীর চাকরী নেওয়ার প্ল্যান ভাঁজার সঙ্গে এ চাকরীটার জন্য ফাইট করার প্ল্যান তো খাপ খায় না।'

মাধব রাগ করে না। বরং খুসী হয়েই বলে, 'ইনস্‌টিনক্‌টিভলি মূল কথাটা ধরতে পারেন বলেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ভাল লাগে। কি ঠিক করেছিলাম জানেন? দিল্লীর চাকরীর খাতিরেও এ চাকরীটার জন্য ফাইট বন্ধ করব না। এরা হুকুম ফিরিয়ে নেবে, স্বীকার করবে অন্যায় হয়েছিল, তারপর এখানে রিজাইন দিয়ে আমি দিল্লী চলে যাব। মানসী এটা হতে দিল না।'

নরেনের ধাঁধাঁ লাগছিল। তবু আর কথা না বাড়িয়ে সে বলে, 'এবার বুঝেছি। একটা বই দিন না?'

মোটা আর ভারি ওজনের একটা বই তাকে দিয়ে মাধব বলে, 'বুঝতে একটু কষ্ট হবে—তবু পড়ে ফেলুন।'

বস্তির ঘরে ফেরার পথে নরেন মানসীকে নতুন দৃষ্টিতে নতুন ভাবে বিচার করার চেষ্টা করে।

মানসীর জন্য সমবেদনা থাকলেও তাকে নরেন তেমন পছন্দ করতে পারত না।

সে বরাবর জানে মাধবের দার্শনিক আদর্শপন্থী স্বার্থপরতা সত্যই অসহনীয় যে কোন স্ত্রী ও মার কাছে।

ওই স্বার্থপরতা মেনে নিত বলে মানসীর উপর তার বিতৃষ্ণা জাগত না।

স্বামীকে মানতে হলে, তার ও তার সন্তানের ভরণপোষণের মালিক ও দায়িক স্বামীকে মানতে হলে, তার আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চ্চার স্বার্থপরতাকে না মেনে কোন উপায় ছিল না মানসীর।

কারণ, এ রকম জ্ঞানচর্চ্চা করে বলেই, সে এই ধরণের স্বার্থপর দার্শনিক বলেই,

মাসে মাসে বেতনের নামে তাকে সাড়ে চারশ' টাকা ঘুষ দিয়ে বশে রাখার প্রস্তাব আসে দিল্লী থেকে।

ঘুষ অথবা পুরস্কার অথবা মজুরি।

মাধবও খেটে খায় বৈকি, বৌ ছেলেমেয়েকে খাওয়ায় বৈকি। সেকেলে ঈশ্বরের সাধকের মত এই রকম জ্ঞানের সাধক সেজে, দিবারাত্রি এই জ্ঞানচর্চ্চায় মেতে থেকে, সাধারণ মানুষের কাছে এই রকম জ্ঞানের বাজার দর বজায় রাখতে সাহায্য করছে বলেই তো মাসে মাসে তাকে সাড়ে চারশ' টাকা দেওয়া সমীচীন মনে করে দিল্লীর জ্ঞানীরা।

মানসীর আর্থিক উচ্চাশা এবং তার প্রতিক্রিয়া মাধবের মনে অসন্তোষ জাগিয়েছিল বলেই, অসন্তোষটা তার জানাচেনা মানুষের কাছে আর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল বলেই, দিল্লীর চাকরীর নিমন্ত্রণ সে পেয়েছিল।

মানসী এসব না বুঝতে পারে। সেজন্য নরেন তাকে দোষ দেয় না।

কিন্তু সে কেন প্রশ্রয় দিত, নিজেকে সমর্পণ করত, নত হয়ে মেনে নিত দিল্লীর সাড়ে চারশ' টাকার দাম কষা? মাধবের জ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতারও বাড়তি স্বার্থপরতা?

তার পাগলামি করার স্বার্থপরতা?

আগে জানত না। এখন নরেনের যেন মনে হয়, সে আগেই জানত মাধবের চাকরী গেছে শুনলেই মানসী তাকে আখের চিবানো ছোবড়ার মত ত্যাগ করবে।

নত হয়ে মাধবের অসহনীয় স্বার্থপরতা সইতে সইতে আসছিল বলেই তো মাধবের চাকরী হারানোর ধাক্কায় ফেটে পড়তে হল—গটগট করে চলে যেতে হল দিদির কাছে। আগে থেকে প্রয়োজনেরও বেশী মানা না মানলেই হত মাধবের স্বার্থপরতা? এ রকম চরম বোঝাপড়ার বদলে মাধব বাড়াবাড়ি করলে রেগে উঠলেই হত যে সে বাড়াবাড়ি সইবে না? মাধব সংযত হত।

আজ মাধব যা বুঝেছে আগেই তাহলে সেটা খানিক খানিক বুঝত। এভাবে জমানো রাগ ফেটে গিয়ে দিদির কাছে ছুটতে হত না মানসীকে।

৯

নরেন জানে, মাধব তাকে বাঁচাতে পারবে না।

চাকরী খুইয়েও মাধব যে নিজের দু'বছর ধরে খেটেখুটে লেখা বই নিজে ছাপাতে চায়, বইটার প্রেস কপি তৈরী করে প্রুফ দেখার জন্য তাকে দু'চার টাকা দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে চায়—এর মধ্যেই আছে মাধবের বাস্তববুদ্ধির অভাবের বাস্তব পরিচয়।

এত বড় জ্ঞানী, জ্ঞান দিয়ে জগৎ সংসারটাকে জেনে ফেলেছে, বুঝে গিয়েছে বস্তু এবং শক্তির মানে, সম্পর্ক ও মর্মকথা—কিন্তু সে এই ছোট সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানটা চাকরী হারিয়েও অর্জন করতে পারছে না যে সে জ্ঞানী হলেও দাস।

এই দাসত্ব ঘুচিয়ে সকলের এগোনো ছাড়া, শিক্ষা সভ্যতা বাড়ানো ছাড়া, সুন্দর সুস্থ আনন্দময় জীবন চাওয়া ছাড়া মানেই হয় না তার বা অন্য যে কোন মানুষের জ্ঞান নিয়ে মেতে থাকার।

মানুষকে এড়িয়ে মনুষ্যত্বকে এড়িয়ে মাধব চায় মানুষের জ্ঞানের সম্পত্তি একা দখল করে একচেটিয়া কারবার করতে।

বস্তিতে চারজন অশিক্ষিত জীবিকা-কামীদের সঙ্গে একটা খোলার ঘরে গাদাগাদি করে নরেন বাস করে। কোন বেলা অন্ন জোটে কোন বেলা জোটে না, একমাসের আগাম ভাড়া দিয়ে পরের মাসের ভাড়া গুণতে পারবে কি না জানা থাকে না।

তবু মনে হয় এটাই ভাল। কি হবে না হবে কিছুই ঠিক না থাকলেই কিছু হওয়ানোর জন্য করানোর জন্য ঝোঁক আসে, জিদ চাপে।

গ্রাজুয়েট যুবক একটা চাকরী পেলেই শেষ হয়ে যায় মানুষ হিসাবে তার অন্য

সব কিছু পাওয়ার ঝোঁক,—চাকরী করে কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যেন জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

মাধবের কঠিন—অতি কঠিন বইটার এগার নম্বর ফর্মার প্রুফ মাধবের দেওয়া মোটা ডিক্‌সনারীটার বানানের সঙ্গে সাবধানে মিলিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল নরেনের।

চোখের দোষ ছিল না, দিনের আলোই ঝাপসা হয়ে এসেছে।

ডিম ভরা একটা তারের ঝুড়ি হাতে নিয়ে মন্টু ঘরে ঢুকতে নরেনের ধৈর্য্য আর মনোযোগ দুই-ই শেষ হয়ে যায়।

দীননাথ এখনো কাজ বাগাতে পারে নি, অন্য একটি ছেলের দেখাদেখি মন্টু ঘুরে ঘুরে ডিম বেচা সুরু করেছে।

'গোটা দুই কাঁচা খেতে দিবি মন্টু? কাঁচা ডিম খেলে গায়ে জোর বাড়ে।'

'দাম দিলে দুটো কেন দশটা দিতে পারি।'

'দুটো ডিম কত দিয়ে কিনলে তোর ক'পয়সা লাভ থাকবে?'

'বড় মাদ্রাজী পাঁচ আনা জোড়া কেনেন, ছোট দেশী সাড়ে চার আনা জোড়া কেনেন, দু' পয়সা বাগাবই।'

'মোটে দু'পয়সা?

'পঞ্চাশ দু' পয়সায় কম হল নাকি?'

নরেন আশ্চর্য্য হবার ভাণ করে বলে, 'তাই তো, পঞ্চাশ দু'পয়সা! ও বাবা সে যে অনেক পয়সা রে—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো পয়সা! পুরো এক টাকা ন' আনা! খুব লাভের ব্যবসা ধরেছিস তো মন্টু!'

তার হাল্কা সুরের হাল্কা কথায় মন্টু আহত হবার বদলে খুসীই হয়। আজ দিন তিনেক সে সুরু করেছে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ডিম বেচার ব্যবসা অথবা কাজ। ব্যবসা এটা নয়—বাজার থেকে চাকর দিয়ে ডিম আনার

সাধ্য যাদের নেই, চাকরই যাদের নেই—তাদের বাজার থেকে ডিম কিনে আনবার চাকরের কাজটাই সে করে দেবে সস্তায়।

এটা হিসাব করেই নরেন হাল্কা সুরে কথা বলেছিল। মণ্টু যে অনেক দূরের বাজারে হেঁটে গিয়ে পাইকারি দরে ডিম কিনে এনে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে ডিম বেচে দুটো পয়সা রোজগার করছে—এটা সে আগেই টের পেয়েছিল।

গত দুদিন সে কাগজের ঠোঙায় কয়েকটা ডিম আনত কাগজের ঠোঙাতেই ডিম নিয়ে ফেরি করতে যেত।

আজ তারের ঝুড়িতে সে একেবারে পঞ্চাশটা ডিম এনেছে। ডিম বেচে লাভ করা যায় এটা হাতে নাতে না জেনে সে তার ব্যবসা এতখানি বাড়াতে সাহস পেত না।

'এতগুলো বেচতে পারবি ?'

'পারব। কিন্তু পচা ডিম বেরিয়ে যায়। ওদিকে বেছে আনতে দেবে না—এদিকে পচা ডিম বদল দেবার কড়ারে ছাড়া লোকে কিনবে না—লাভটা খেয়ে দেয় পচা ডিমে।'

এটা সমস্যা বৈকি। ডিম ফেরি করার সব চেয়ে বড় সমস্যা। তবু এই সমস্যাটাকে পর্য্যন্ত জয় করে মণ্টু কয়েক আনা লাভ করছে—যে পয়সায় একবেলা খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, একটু খাদ্যের সঙ্গে বেশী অখাদ্য মিশেল দিয়ে খেয়ে—মণ্টু কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারবে।

নরেন ভাবে, ডিমের ব্যবসায়েও কি ওই এক নিয়ম ?

ছোট বড় ডিম, পচা ডিম বেছে আনতে না দেওয়ার কায়দায় মণ্টুর লাভ দাঁড় কষিয়ে দেওয়া হবে সারাদিনের মজুর খাটার দামে ? মণ্টু ডিম এনে সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে বেচে লোকসান দেবে না—একটা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট সম্বল করে একবেলা আধপেটা খাদ্য আর দু'পয়সায় চীনা বাদাম চানচুর খেয়ে যথারীতি মণ্টু বেঁচে থাকবে ?

এভাবে বেঁচে থাকার জন্যই চালিয়ে যাবে ডিম বেচার মজুরগিরি ?

মণ্টু একেবারে মরে গেলে সে তো আর পাইকারি ডিম কিনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেচতে পারবে না।

ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে মণ্টু যাতে ডিম বিক্রী করতে পারে সে হিসাবেই ঠিক হয়েছে ডিমের দর, শতকরা পচা ফেরতের নিয়ম, ডিমের দরের তারতম্য ?

সে আরও কিছু বলবে কিনা সেজন্য অপেক্ষা না করেই মণ্টু ডিমগুলি সামলে রাখার চেষ্টা সুরু করেছে দেখে নরেন ভারি খুসী হয়।

পৃথিবীর সমস্ত গরীব মানুষের বাঁচার নিয়মকে মণ্টু যেন সম্মান দিচ্ছে তার পাইকারি দরে কিনে আনা ডিমগুলি ঠিকঠাক সামলে রাখার চেষ্টা দিয়ে— যাতে ভোর ভোর বেরিয়ে চারিদিকে সমস্ত এলাকা ঘুরে এই পঞ্চাশটা ডিম বিক্রী করা সুরু কবা চলে।

তখন আসে নন্দন।

অন্য বেশে, অন্য এক নন্দন।

নতুন ধুতি নতুন জামা তার ভাগ্যে জুটেছে কদাচিৎ। বরাবর সে হেমেন্দ্র আব গোবিন্দের পুরাণো ধুতি আর জামা পেয়ে কোনরকমে চালিয়ে দিয়ে এসেছে।

আজ তার পরণেব ধুতি আর পাঞ্জাবীর নতুনত্ব তাকালেই চোখে পড়ে। ধুতিটা বোধ হয় একবারের বেশী ধোপ খায় নি—কোরাত্বের ছাপ রয়ে গেছে। পাঞ্জাবীটা আন্‌কোরা—ঘরে হয় তো একবার সাবান কাচা করা হয়েছে।

নন্দনের চোখে মুখেও একটা নতুন ভাবেব ছাপ।

'চাকরী পেয়েছিস, না ?'

'পেয়েছি। গোবিন্দ চাকরী করে দিয়েছে।'

কথা আর বলার ভঙ্গি থেকেই নরেন টের পায় গুরুতর কিছু ঘটেছে।

সেদিন মাধবের কাছে পেটের দুরন্ত খিদেয় ঝিমিয়ে পড়ার গুরুত্ব নিয়ে গিয়ে

তার গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার আগে যেমন অস্থিরতা বোধ হয়েছিল, আজ অবিকল তেমনি ব্যাপার ঘটে।

সে বোধ করে কিছু না খেয়ে বন্ধু ও তার আপনজনের জীবনে গুরুতর ব্যাপার ঘটার বিবরণ শোনার সাধ্য তার নেই।

'একটু থাম। খিদেয় গা গুলোচ্ছে। কটা পয়সা দে—কিছু আনিয়ে খাই। তারপর শুনব।'

নন্দন বন্ধুর মুখের দিকেও তাকায় না। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'দাঁড়া আসছি।'

দু'চার পয়সায় খাবার আনতে বেরিয়ে গিয়ে সে কত যে দেরী করে ফিরে আসতে!

নরেনের মনে হয়, আর বুঝি সে ফিরবে না—তার গুরুতর কথার চেয়ে খিদেকে বড় করায় বন্ধু বুঝি রাগ করেই চলে গেল!

নন্দন ফিরে আসে দু'ভাঁড় গরম দুধ আর দু'খানা টোস্ট নিয়ে।

নরেন ধাতস্থ হয়। ঠিক কথা—জগৎ নিয়মে চলে। দু'মুঠো মুড়ি খেয়ে দিনটা তাকে পাত করতে হচ্ছিল বলেই কি নিয়ম পাল্টে যাবে জগতের?

দুটি পয়সায় মুড়ি খেয়ে সে যে রুখেছে কালাচাঁদের দলে যোগ দেবার শুধু ইচ্ছাটা প্রকাশ করেই রুটি মাংস পেট ভরে খেয়ে আসার তাগিদ, সেটা কখনো ব্যর্থ হতে পারে?

সে অবশ্য ভেবে পায় নি, আজকেই তার একভাঁড় দুধ আর একখণ্ড টোস্ট জুটে যাবে।

কিন্তু সে ভেবে পায় নি বলেই কি এটা অনিয়ম?

নিয়ম কি তার ভাবনার তোয়াক্কা রাখে?

বেশ গরম ছিল দুধটা। বেশ মচমচে ছিল টোস্টটা।

একেবারে রাজভোগ!

'কি ব্যাপার বলতো এবার শুনি?'

'গোবিন্দ স্যুইসাইড করেছে।'

দুই বন্ধু নির্বাক হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে। ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়—পরস্পরকে তারা দেখতে পায় না।

পরস্পরের মুখ দেখার সাধও তাদের হয় না।

গোবিন্দ আত্মহত্যা করেছে!

শুধু উচ্চাকাঙ্খায় নয়, অনেক দিক দিয়ে বিভ্রান্ত গোবিন্দ।

তা এরকম বিভ্রান্তেরাই তো আত্মহত্যা করে।

কি বিষম নীতি এতকাল পালন করে এসেছে তার বাড়ীর লোকেরা—কি রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক নীতি! নন্দনকে চাকর করে রেখে তাকে ঘরের ছেলে হয়ে থাকার সব রকম অধিকার দেওয়ার নীতি! মাস্টার অব আর্টস্ হয়েও নন্দন আজ এতকাল বেকারির বোঝা বইতে পেরেছে, দোকানটা নষ্ট হওয়ার ধাক্কায় ক'মাসে কাবু হয়ে গোবিন্দ আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ল!

এ সব স্থায়ী কারণ—একটা বিশেষ অবস্থায় পড়লে লড়াই করার বদলে আত্ম-হত্যার ঝোঁক চাপার কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণও কিছু একটা ছিল নিশ্চয়?

'বাড়ীতে রাগারাগি হয়েছিল, না? ঝগড়া-ঝাঁটি খোঁচা দেওয়া টিটকারী এসব সুরু হয়েছিল তো?'

নন্দন মাথা নাড়ে।

'ওসব বিশেষ হয় নি। রাগারাগির বদলে সবাই আপশোষ আর হা-হুতাশটাই বেশী করে এসেছে।'

'সেটা সোজা টিটকারী নয়। শুনতে শুনতে গোবিন্দ নিজেকে বেশী বেশী ধিকার দিত, বেশী বেশী অপমান বোধ করত।'

'ঝগড়া একটা হয়েছিল—ছবির সঙ্গে।'

'ছবির সঙ্গে ?'

নরেন সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। ছবিরাণী তো মোটেই ঝগড়াটে মেয়ে নয়—সে তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না!

নন্দন বলে, 'ছবির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বেধেছিল। আমিও লক্ষ্য করছিলাম, কিছুদিন থেকে ছবি কি রকম ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে—হ্যাঁরে, ছবির সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল ?'

নরেন সায় দিয়ে বলে, 'হয়েছিল। ছবির হিসেব খুব সোজা—আমার কোন দিন আর চাকরী-বাকরী হবে না। কাজেই বাপ-দাদার ঘাড়ে পড়ে থাকার চেয়ে যা জুটছে তাই মেনে নেওয়া ভাল। একজনেরটা খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো ওকে।'

নন্দন গম্ভীর মুখে বলে, 'ও! এবার বুঝেছি। তুই চাকরীর চেষ্টা করতে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছিস, চাকরী না বাগিয়ে বাড়ী ফিরবি না,—এ খবরটা শোনার পরেই ছবির ছটফটানি সুরু হয়।'

ছবিরাণীর ছটফটানি। অন্য সময় হয় তো এ বিষয় আরও কিছু শুনবার সাধ নরেনের হত, আজ কিন্তু ছবিরাণীর প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সে কেবল গোবিন্দের কথা শুনতে চায়।

'কি নিয়ে ওদের ঝগড়া হল ?'

কিন্তু গোবিন্দের কথাতে ছবিরাণীর কথাও আসে।

নন্দন বলে, 'কোথাও কিছু নেই ছবি হঠাৎ জিদ ধরল, বিয়ের তারিখ দু'তিন মাস পিছিয়ে দিতে হবে।' কেন দিতে হবে ? না, তাড়াহুড়ো করে একজন আজে-বাজে লোকের হাতে তাকে সঁপে দেওয়া হচ্ছে—তা চলবে না। এটা হাতে থাক—কয়েকটা মাস দেখা যাক। ইতিমধ্যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু করতে পারবে—তার মন বলছে পারবে। কাজেই এরকম দূর দূর করে তাকে তাড়াতে হবে না। গোবিন্দ ভাবল ছবি বুঝি তাকে খোঁচা দিচ্ছে, টিটকারী দিচ্ছে—দোকান খুইয়ে বোনটাকে পর্য্যন্ত যার তার কাছে বলি দেবার কথা বলছে। ছবি

যত বলে যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু করতে পারবে—গোবিন্দ তত চটে যায়। তারপর ছবিও গেল রেগে।—'

নন্দন একটু চুপ করে থেকে অন্য সুরে বলে, 'ছবিকে আমি কোনদিন এরকম রাগতে দেখি নি। বড় ভাই—তাকে যা মুখে এল বলতে লাগল, শাপতে লাগল। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল ছবির মার—গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে সুরু করল। একবার ছবিকে গাল দেয়, একবার গোবিন্দকে গাল দেয়। তুই তো জানিস ছবির মাকে, বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, 'কি ভাবে—?'

'বিষ খেয়ে। ছবির মা মুখ খুলতে হঠাৎ গোবিন্দ কেমন চুপ হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে জামা-টামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সকলের একটু ভয় করতে লাগল—কিছু না করে বসে। রাত্রে বাড়ী ফিরল, শুধু একটু গুম্ খাওয়া ভাব, আর কিছু নয়। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে ঘুমোতে গেল। তারপর রাত্রে কখন উঠে বেরিয়ে গেছে কেউ টের পায় নি। শেষ রাত্রে পুলিশ এসে ডাকাডাকি, নগেন আর বিপিনের বড় কাপড়ের দোকানের সামনে গোবিন্দ মরে পড়ে আছে—নাম ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।'

এ কী নাটক? কি মানে এই সাধারণ পরিবারের সাধারণ একটা ছেলের সাধারণ ভোঁতা জীবনের এই নাটকীয় পরিণতির?

নরেনের মনে হয় সাধারণ মানুষের জীবন যত অসাধারণ নাটকীয় উপাদান এবং ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় ঠাসা হয়ে আছে, দু চারটে এই রকম ফেটে-পড়া নাটকীয় ঘটনা তারই ঘনীভূত নমুনা মাত্র।

'গোবিন্দ চাকরী করে দিয়ে গেছে বলছিলি?'

'হ্যা, গোবিন্দের জন্যই আমার চাকরী।'

চিঠিতে গোবিন্দ প্রথামত লিখে রেখে যায় নি যে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা

করেছে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বরং মৃত্যুর জন্য অতি পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় নগেন আর বিপিনকে দায়ী করে গেছে। ওরা ঠকিয়ে তার দোকানটা নিয়েছে, তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে।

পরের ঘটনা জানত না তাই নরেন বলে, 'ছেলেমানুষী বুদ্ধি তো। ভেবেছে এরকম চিঠি লিখে রেখে গেলেই নগেন আর বিপিন খুব জব্দ হয়ে যাবে। পুলিশ একটু হয়রাণও তো করে নি ওদের ?'

নন্দন বলে, 'তা করে নি—শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের সবটাই কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছিল ? সত্যই কি বেচারা জানত না এরকম চিঠি লিখে রেখে গেলেও পুলিশের হাতে ওদের কিছু হবে না ? আমার মনে হয় জানত। ছেলেমানুষি ছিল চূড়ান্ত রকম—সেটা বাড়ীর লোকের দোষ। কিন্তু এদিকে চালাকও কম ছিল না ছেলেটা। ওরকম চিঠি লিখে গেলে, ওদের দোকানের সামনে গিয়ে মরলে ওরা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে জব্দ হবে—ঠিক এটা গোবিন্দ চায় নি। সে চেয়েছিল এই ব্যাপার নিয়ে একটা হৈ চৈ হবে, সবাই ওদের ছি ছি করবে। নিজে বিষ খেলেও, ওদের জন্যই তো তাকে বিষ খেয়ে মরতে হয়েছে—এটা জানাজানি হয়ে যাবে। হলও ঠিক তাই। নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগল, টিটকারী দিতে লাগল। কতকগুলি ছেলে সুযোগ পেলেই মারধোর করবার তাকে ফেরে, ঢিল টিল ছোঁড়ে, দোকানের সামনে প্ল্যাকার্ড এঁটে দেয়—আরও কত কাণ্ড। একদিন রাত্রে দোকানের মধ্যে কারা কতগুলি পটকা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।'

নরেন বলে, 'বড় রাস্তায় দোকান, সব সময় কত লোকজন। পটকা ছুঁড়ে কি আর পালিয়ে যেতে পারত ? ওরাই চুপচাপ থেকেছে—নতুন হাঙ্গামা করতে চায় নি।'

মধ্যস্থ স্থানীয় কয়েকজন ব্যাপারটা নিয়ে তারপর একটু আলোচনা করেছিল নগেন ও বিপিনের সঙ্গে। তাদের দোষী করা নয়, দায়ী করা নয়, দাবীদাওয়ার কথা নয়—তবে ছেলেটা এভাবে মরল, বুড়ো হেমেন্দ্র বহুকাল কাপড়ের ব্যবসায়ে ছিল,

বাড়ীর লোকের অবস্থা বড় কাহিল—তারা বরং উদারভাবে নন্দনকে একটা কাজ যোগাড় করে দিক।

ওই কজন নিজেরা যেচে মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিল কিনা নন্দন জানে না, নগেনরাই হয় তো বেগতিক দেখে ওদের মধ্যস্থ করেছিল।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়েছিল। হ্যাঁ, কাজ একটা নন্দনকে তারা দেবে। এটুকু না করলে চলবে কেন? একটা পরিবারকে তো না খেয়ে মরতে দেওয়া যায় না!

এদিকে গোবিন্দের কথা ভেবে নন্দনের প্রাণটা হু হু করে। ওই নগেনদের কাছেই শেষ পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হবে—গোবিন্দের প্রাণের মূল্য দিয়ে যোগাড় করা কাজ?

কিন্তু মুখে সে কিছু বলে নি।

বাড়ীব লোকে যা বলবে সে তাই করবে!

ওবা যদি চায় সে কাজটা করুক, ওরা যদি পারে এই চাকরীর টাকার ডাল-ভাতে পেট ভবাতে—তার কোন আপত্তি নেই।

সে তো নিজেব জন্য চাকরীটা নেবে না।

ছবিরাণী বলেছিল, 'না, তা হবে না। ওদেব কাছে তুমি চাকরী নিলে আমিও বিষ খাব, নয় গলায় দড়ি দেব।'

বলে সে কেঁদে ফেলেছিল। গোবিন্দেব জন্য তখন সকলের শোকটাই টাটকা।

হেমেন্দ্র বলেছিল, 'না। এ কাজ নেয়া যায় না। চল্‌ তো নন্দন আমরা একবার বেরোই।'

নন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হেমেন্দ্র গিয়েছিল চেনা একজন বড় ব্যবসায়ীর কাছে। তার নাম রাধারমন। মোটামুটি ব্যাপার জানা ছিল সকলেরই, খুঁটিনাটি আরও সব বিবরণ জানিয়ে হেমেন্দ্র বলেছিল, 'এ অনুগ্রহ নেয়া যায়, আপনারাই বলুন? আপনারা একটা ব্যবস্থা না করলে তো উপায় নেই আর।'

নগেন ও বিপিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাধারমন সঙ্গে সঙ্গে নন্দনকে একটা কাজে বহাল করেছিল।

'চাকরীটা গোবিন্দের জন্যই। নই'ল কাজ দেবার গরজ কি হত রাধারমনের? নগেন ও বিপিন সর্ব্বনাশ করেছে দাদুর, তার নাতিটাকে দিয়ে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়েছে—সে তাড়াতাড়ি একটা কাজ দিল নন্দনকে। লোকে দেখুক ওরাও কেমন লোক রাধারমনই বা কেমন লোক—তুলনা করুক।'

'কি করতে হয়?'

'হিসাব দেখা থেকে অনেক কিছু। বিশেষ বিশেষ পার্টির সঙ্গে দেখা করতেও পাঠায়—যাদের কাছে এম-এ পাশ করার একটু মর্য্যাদা আছে।'

লণ্ঠনের আলোয় দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে থাকে।

নরেনের মনে পড়ে তার চাকরী হবার পর দুই বন্ধু তারা তফাতে সরে গিয়েছিল। হিংসায় নয়, বিবাদ করে নয়—এক জনের চাকরী করার এবং অরেকজনের বেকারি করার দায়ের জন্য।

আপিসে একটা চাকরী খালির খবর নিয়ে অনেকদিন পরে নন্দনের কাছে গেলে সে বেশ একটু জ্বালাও প্রকাশ করেছিল বন্ধুর অবহেলায়।

আজ আবার অনেকগুলি দিনের অদর্শনের পর নন্দন তার কাছে এসেছে চাকরী পাওয়ার খবর দিতে।

কিন্তু কী নিদারুণ সুসংবাদটা?

নন্দন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাদের আসল দোষ কি জানিস্? জীবনযুদ্ধটা বড় একা একা চালাই। তোর যুদ্ধ তোর, আমার যুদ্ধ আমার। এক সঙ্গে যদি লড়াই চালাতাম—'

'তাও চালাচ্ছি বৈ কি। আমাদের তের জনের জন্য একমাসের ওপর আপিস বন্ধ ছিল, সাতজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। আমরা কজন বাদ পড়লাম অল্পদিন কাজ করেছি বলে।'

দীননাথেরও একটা কাজ জুটে গেছে।

গোবিন্দের নাটকীয় আত্মহত্যা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেলে ব্যবসায়ী সমাজের মুখ রক্ষার জন্য নগেনরাই এগিয়ে এসেছিল নন্দনকে কাজ দেবার জন্য।

গোবিন্দ রেখে গিয়েছে বুকের মধ্যে কাঁচা ঘা, নন্দনেরা ইতস্তত: করেছিল এই উদারতার অপমান গ্রহণ করতে।

রাধাবমন খুসী হয়ে তাদের মান রেখেছে, বলা মাত্র নন্দনকে কাজ দিয়ে অর্জন করেছে ব্যবসায়ী সমাজের মুখ রক্ষার গৌরব।

কেবল নন্দনকে নয়।

দীননাথকেও সে কাজ দিয়েছে।

বলেছে, 'গোবিন্দের দোকানে যারা খাটত তাদের সবাইকে আমি কাজ দেব—না থাক আমার লোকের দরকার, হোক আমার লোকসান। টাকাটাই বড় নাকি জগতে? ঢের টাকা কামিয়েছি, ঢের টাকা কামাব—তাই বলে নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রী করব নাকি টাকার কাছে?'

বলেছে, 'আরেকটা কে ছোকরা কাজ করত শুনলাম গোবিন্দের দোকানে? তার কেউ পাত্তা জানো? খোঁজ পেলে ওকেও ডেকে এনো—ওকেও আমি কাজ দেব।'

তার মহানুভবতার মানে বুঝতে অবশ্য কারো দেরী হয় নি।

মৃত গোবিন্দের জন্য সে যত করবে ততই দশজনের কাছে তার গৌরব—ততই নগেন আর বিপিনের অপমান বদনাম!

নামটাই সকলে জানত—ভোলা। কোথা থেকে জুটিয়ে এনে গোবিন্দ ওকে দোকানের কাজে লাগিয়েছিল কেউ জানে না—গোবিন্দ বড় বেশী প্রশ্রয় দিত নামহীন গোত্রহীন ছোঁড়াটাকে।

দোকানের মালিক বলে গোবিন্দকে যেন গ্রাহ্যই করত না ছেলেটা। বেঁটে মোটাসোটা বেপরোয়া ছেলে—ট্যাবা ট্যাবা গালে বসন্তের দাগ।

মাসে দু'বার তিনবার সে কাজ ছেড়ে দিতে চাইত রুখে উঠে, গোবিন্দ নরম হয়ে তোষামোদ করে তার চাকরী বাঁচিয়ে দিত।

দু'চারটে যোগসূত্র বোধ হয় জানা ছিল দীননাথের—একই দোকানে উদয়াস্ত বালক ও প্রৌঢ় দুজনেই তারা তো করত জীবিকা অর্জন !

সূত্রগুলি ঘেঁটে ভোলাকে খুঁজে বার করার ইচ্ছা নন্দনের কেন হয়েছিল সে নিজেই জানে না।

প্রথম সূত্রই তাকে নিয়ে যায় এক ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নের দোকানে।

ঝাঁঝরায় কড়ায়ের ঘি থেকে সিঙ্গারা ভেজে তুলতে তুলতে শ্রীকান্ত চক্রবর্তী বলে, 'ভোলা ? ভোলা ফিরে গেছে মার কাছে।'

চেঁচিয়ে বলে, 'তোরা কেউ জানিস নাকি ভোলার ঠিকানা ?'

যোয়ান বয়সী যে লোকটা খাবার বেচছিল সে পূবের সহরতলীর একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, 'ওখানে পাবেন ছোঁড়ার মা-টাকে। ছোঁড়াকে একবার আসতে বলবেন তো মশায়।'

ঠিকানায় গিয়ে নন্দন জেনেছিল, ভোলা আর তার মা দুজনেই একদিনে কলেরায় স্বর্গে চলে গেছে।

খবর শুনে দীননাথ ভেবেছিল, ভোলা যখন স্বর্গেই গেছে, ভোলাকে কাজ দিতে চেয়েও যখন কিছুতেই তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না—কাজটা মণ্টুকে দিলে দোষ কি হয় ?

প্রস্তাব শুনে রাধারমন বলেছিল, 'তুমি তো বড় ছ্যাচড়া লোক হে ? তোমায় নিলাম তাতে খুসী নও ? ছেলেটাকেও ঢোকাতে চাও ?'

দীননাথ সবিনয়ে বলেছিল, 'একটা ছেলেকে কাজ দিতে চাইলেন। ছেলেটা স্বর্গে গেছে। মোর ছেলেটা বসে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। তাই বলছিলাম।'

রাধারমন উদারভাবে বলেছিল, 'সোজা কথাটা বোঝ না কেন বল দিকি ?

কাজ কি আমার দেয়ার ছিল, লোক নেবার দরকার ছিল? নন্দন আর তোমাকে দিয়েছি বাড়তি কাজ—তোমাদের ছাড়াই আমার কারবার চলে। কিন্তু কি করি বলো, দশজনা চাইছে, কাজ তোমাদের দিতে হল। বেঁচে বর্তে থাকলে ভোলাটাকেও কাজ দিতে হত। তাই বলে তোমার ছেলেটাকেও আমার ঘাড়ে চাপাবে?'

৯

সে যে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে যায় নি, ওরকম ছেলেমানুষী অভিমানের ধার যে সে ধারে না, এটা প্রমাণ করার জন্য নরেন দু'চার দিন পরে পরেই বাড়ী গিয়ে সকলের খবর নিয়ে আসে।

বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

বাড়ীর আপন মানুষগুলিকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না!

তার সঙ্গে সকলের কথা ও ব্যবহারে এমন একট' কৃত্রিমতা এসে যায়, এমন একটা আড়ষ্টভাব সকলে দেখায় যে কিছুক্ষণ বাড়ীতে থাকতেই নরেনের যেন দম আটকে আসে।

এর চেয়ে ছেলেমানুষী রাগ আর অভিমানের বশে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াই বরং ভাল ছিল, দেখা করতে এলে মা বাবা ভাইবোন খানিকটা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারত, এরকম বিব্রত হওয়ার বদলে তার রাগ ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে পারত।

বাড়ীর লোক তার সঙ্গে কেন এরকম করে নরেন তার কারণটা বোঝে। কিন্তু সেটা এমন একটা কারণ যে প্রতিকারের উপায় ভেবে পায় না।

সে রাগ করে যায় নি, না ডাকতেই এসে আপন জনের খবর নিচ্ছে, সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে, এটা ওটা খেতে দিলে খাচ্ছে—দেখাচ্ছে

যেন খাপছাড়া কিছুই ঘটে নি—তার বাড়ী ছেড়ে যাওয়াটা অতি সাধারণ তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

এর ফলে সকলে যেন অপরাধী বনে গিয়েছে তাব কাছে। সে যাই বলুক আর যাই করুক, তাদের খারাপ ব্যবহারেই যে তাকে বাড়ী ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে—এই সত্যটা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

তারা করেছে ছোটলোকামি—কিন্তু সেটাও নরেন উদারভাবে ক্ষমা করেছে! তাদের জন্য পরের মত বস্তিতে গিয়ে বাস করতে হলেও পর সে তাদের পর করে দেয় নি, নিজে পর হয়ে যায় নি।

কেবল দেখিয়ে দিয়েছে তারা কত সস্তা মানুষ, কত ছোট তাদের মন।

এই অপরাধের বোধটাই সকলের কথা ও ব্যবহারে আড়ষ্টতা এনে দেয়, প্রাণ খুলে সহজভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

উষা একদিন খুব ভয়ে ভয়েই একটা প্রস্তাব জানায়। নরেন টের পায় কথাটা তার নিজের মাথায় গজায় নি—মা বাবাই কথাটা ভেবেছে এবং পরামর্শ করে নিজেরা না বলে উষাকে দিকে তাকে বলাচ্ছে।

উষা বলে, 'তুমি এক কাজ করলে তো পার দাদা? তুমি বাড়ীতে থাকলে তো কোন বাড়তি খরচ নেই—সেই বাড়ী ভাড়া গুণতেই হবে। বাড়ীতে এসে থাকো, ওখানে যেমন নিজের সব ব্যবস্থা নিজে করছ এখানেও তাই কর। আমাদের এরকম বিশ্রী লাগবে না।'

'বিশ্রী লাগবে না? আরও বেশী বিশ্রী লাগবে।'

'তুমি বুঝছ না।' এখন কি রকম হয়েছে জানো?—আমরা যেন তোমায় বাড়ী থেকে খেদিয়ে দিয়েছি। লোকে বলছেও তাই। বাড়ীতে থাকলে আমাদেরও ওরকম মনে হবে না, লোকেও কিছু বলতে পারবে না।'

মেয়ের কথায় সায় দিয়ে মা ব্যগ্রভাবে বলে, 'ঠিক কথাই তো। তুই বলছিস রাগ করিস নি, রাগ করে বাড়ী ছাড়িস নি। তবে বাড়ীতেই এসে থাক– ওখানে যেমন ব্যবস্থা করে খাচ্ছিস, এখানেও তেমনি করবি।'

নরেন শান্তভাবে বলে, 'তা হয় না।'

উষা বলে, 'তার মানে তুমি রাগ করেছ সত্যিই, দেখাচ্ছ যে রাগ করনি। এক বাড়ীতে আমাদের সাথে তুমি থাকতে চাও না।'

কেন সে বস্তির ঘর ছেড়ে এখানে এসে থাকতে রাজী নয় তার কারণটা নরেন বলবে না ভেবেছিল কিন্তু এবার না বলে উপায় থাকে না।

'একটা কথা হিসেব করছিস না। একবেলা খেয়ে, চাট্টি মুড়ি চিড়ে খেয়ে, কোনদিন কিছু না খেয়ে আমাকে দিন কাটাতে হয়। এখানে এসে আমি না খেয়ে থাকব—তোরা খাওয়া দাওয়া করবি —আরও বিশ্রী লাগবে না সেটা?'

তারা চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে গেলে আরও বেড়ে গিয়েছিল সকলের বিব্রতভাব, কথাবার্তার কৃত্রিমতা।

তারা তাকে শুধু বস্তির ঘরেই তাড়ায় নি, তাদের জন্য সে আধপেটা খেয়ে, উপোস করে দিন কাটায়। তার কাছে নিজেদের আরও বেশী অপরাধী মনে হয় সকলের।

কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঝে মাঝে এভাবে বাড়ীতে খবর নিতে না গেলে সন্ধ্যার ব্যাপারটা জানতে নরেনের হয় তো অনেকদিন দেরী হয়ে যেত।

সন্ধ্যা সেদিন একলা বাপের বাড়ী আসে। ছেলেমেয়ে দুটিকে বহন করে।

অশোকের সঙ্গে এই সেদিন যে সন্ধ্যা একা এসেছিল যুদ্ধ করে বাপ-ভায়ের কাছে টাকা আদায় করার জন্য—তার গ্র্যাজুয়েট স্বামী আরও পাশ করে মাস্টার অব আর্টস হবার যুদ্ধে নামবে বলে বাপভাই যে টাকা খরচ করতে রাজী হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুত খরচের বাকী অংশ আদায়ের জন্য—এ সন্ধ্যা যেন সে সন্ধ্যা নয়।

সন্ধ্যা ঝগড়া করতে আসে নি। সন্ধ্যা মান অপমান-ভরা স্বামিত্ব গর্বিণী মেয়ে হিসাবে আসে নি।

সন্ধ্যা আসে নি অশোক বা অশোকের পরিবারের কোন বিপদকে আপন করে নিয়ে অশোকের পক্ষ নিয়ে বাপ-ভায়ের সঙ্গে লড়াই করতে।

তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে অশোকের বাপ মা। প্রতিবাদ না করে নীরবে চেয়ে থেকেছে অশোক।

চাকুরে ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়াটা হাসিল করতে বেচারা আপিসের মাত্র সাতশ' টাকা সরিয়ে ছিল—বাড়ীতে কঠোর দারিদ্র্য পালন করে তিন মাসের মধ্যে বে-আইনী ভাবে নেওয়া টাকাটা শোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে।

সে তো জানে তার আপিসেই লক্ষ টাকার কিরকম এদিক গমন ওদিক গমনের হিসাবটা টাকা পয়সার হিসাবে উহ্য থাকে।

দু'মাস কি বড় জোর তিনমাস। তিন মাসের মধ্যে নিশ্চয় সে পারবে টাকাটা যথাস্থানে পূরণ করে দিতে।

মোটা তহবিল নয়। আসল তহবিল থাকে ক্যাশিয়ার ফণিবাবুর হেপাজতে। তার দশ হাজার টাকা জামানত দেওয়া থাকলেও আরও দু'জন মোটা জামানত দেনে-ওলা কর্মচারীব সই ছাড়া মোটা টাকা নাড়াচাড়া করার অধিকাব ফণিবাবুর নেই।

বিলাতী বড় সায়েব নিজে সপ্তাহে যখন তখন দু'তিন বার এসে তহবিল পরীক্ষা করে যায়।

হাজার তিনেক নগদ টাকা অশোকের হেফাজতে সব সময় রাখতে হয়। এত বড় আপিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়ার জন্যই বাধ্য হয়ে রাখতে হয়।

তারও পাঁচশ' টাকা জামানত আছে। হাফ পার্সেণ্ট সুদে জামানত টাকাটা গোকুলে বাড়ছে তিলে তিলে। সে জানত যত কম টাকা দিয়ে তার কাজটা চালানো যায় কেবল তত টাকাই তার হেফাজতে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে তাকে ফণিবাবুর কাছ থেকে টাকা বার করে এনে আপিসের কাজ চালাতে হয়।

তার তহবিল কেউ কোনদিন পরীক্ষা করতে আসে না। তার কোন প্রয়োজনও নেই। কোম্পানীর পক্ষে কাকে সে খুচখাচ কত টাকা দিয়েছে তার হিসাব থাকে অন্যত্র।

তার কাজটাই হল বড সায়েবের আর তিনজন বড কর্মচারীর সই করা বা

ইনিসিয়াল করা সাদা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে পাঁচ দশ বিশ টাকা নগদ দিয়ে দেওয়া।

পুরো সই করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে। ইনিসিয়াল করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে!

বছরের পর বছর চলে আসছে এ নিয়ম—কে জানত তিন মাসে ঠিক করে দেওয়ার প্ল্যান করে মোটে সাতশ' টাকা কাজে লাগাতে যাওয়া মাত্র প্রয়োগ হবে দুর্নীতি দমন নীতির তাণ্ডব? লাখ লাখ টাকা যারা এদিক ওদিক করে এসেছে তারাই তাকে ধরবে?

বড়ই বিপদে পড়েছে অশোক।

এ তো গেল দুঃসংবাদ।

এবার আসল সংবাদটা কি? এভাবে সন্ধ্যার একলা আসার কারণ কি? কারণ সকলেই বুঝেছে কিন্তু সন্ধ্যার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সে প্রসঙ্গ তোলা যায় না।

সন্ধ্যা বোধহয় আশা করেছিল মা বাবা একজন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'এরকম একলা যে এলি?'

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে বুঝতে পারে প্রশ্ন তাকে কেউ করবে না, আপনা থেকেই তাকে কথা তুলতে হবে।

ক্ষোভে সন্ধ্যার চোখে বোধ হয় জল আসে। জিজ্ঞাসা করা হলে হঠাৎ এভাবে আসার কারণ কিভাবে বলবে মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছিল, এখন সব গুলিয়ে যায়।

সোজাসুজি সে দাবী জানিয়ে বলে, 'এবার আমাদের ওই পাওনা টাকাটা দিতে হবে বাবা।'

'টাকার কথা কি?'

'বলরাম বাবু ক্যাশিয়ার বাবু ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রেখেছেন—বদ খেয়ালের জন্য নয়, বোনের বিয়ের দায় সামলাতে নিয়েছে, আস্তে আস্তে টাকা ফিরিয়ে দেবার

উদ্দেশ্যেই নিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে টাকাটা জমা দিলে ওঁরা কিছু করবেন না বলেছেন, চাকরীও যাবে না। শুধু এ কাজ থেকে অন্য কাজে শরিয়ে দেবেন। তোমার কাছে ওর পাওনা টাকা পেলে বাকীটা যোগাড় করে নেবে।'

পাওনা টাকা! পড়ায় ফাঁকি দিয়েও পড়ার খরচের টাকাটা পাওনাই রয়ে গেল অশোকের।

সন্ধ্যার গায়ে একখানাও গয়না নেই। তার খালি গায়ের কথাটা এতক্ষণ কেউ উ ল্লেখ করে নি, এবার তারিণী বলে, 'তোর গয়না দিয়ে বাকীটা যোগাড় হবে তো?'

'দু' একখানা করে লাগবে—আমার আর শাশুড়ীর। কিছু টাকা ধার করার চেষ্টা হচ্ছে, ধার পাওয়া গেলে আর গয়না লাগবে না। তোমাব টাকাটা পেলেই হাঙ্গামা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।'

তারিণী নিশ্বাস ফেলে।

সে নিশ্বাসের অর্থ এই যে এ জীবনে আমাবও হাঙ্গামা মিটেছে, তোমাদেব হাঙ্গামাও মিটেছে। বেঁচে থাকাটাই নিছক হাঙ্গামার ব্যাপাব।

আরেকটা নিশ্বাস ফেলে তারিণী বলে, 'কি আর বলব বল তোদের? জানিস আমার টাকা নেই, তবু আমাকে এসেই চেপে ধরবি টাকার জন্য।'

সন্ধ্যা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলে, 'বলে দিয়েছে, টাকাটা না নিয়ে যেন ফিরে না যাই'

খালি হাতে ফিরে গেলে তার কপালে কি জুটবে সে আব মুখ ফুটে বলে না।

ঊষা তীব্র কণ্ঠে মন্তব্য করে, 'অশোকদা' এমন ছোটলোক?'

বরেন আরও বেশী ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'খালি অশোক কেন? ওদের বাড়ীর সবাই ছোটলোক। ওটা ছোটলোকের বাড়ী।'

ঊষা বলে, 'তুমি আমার বিয়ে দিও না বাবা—দোহাই তোমার। চিরকাল আইবুড়ো থাকব—দরকার হলে ঝি-গিরি করে খাব'

বাপের বাড়ীতে সন্ধ্যা এসেছে একলাই, তবে গলির মোড় পর্যন্ত পৌছে দিতে সঙ্গে এসেছিল একটি ছেলে।

পাঁচুকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল যে সন্ধ্যার বাপের বাড়ীতে ঢোকা তো দূরের কথা সে গলির মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকবে না। গলির মোড় পর্যন্ত সন্ধ্যাকে পৌছে দিয়ে সটান বাড়ী ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা ছেলেমানুষ পাঁচুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই হুকুম রদ-বদল করাবার কোন চেষ্টা করে নি। মুখে একবার অনুরোধ জানালে ফিরে গিয়ে পাঁচু হয় তো নালিশ করবে যে তার বাপের বাড়ীতে নেওয়ার জন্য সন্ধ্যা তার হাত ধরে টানাটানি করেছিল!

তাকে শুধু গলির মোড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল—বাপের সঙ্গে ভায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যদি কোন খবর দেবার থাকে, যদি কোন চিঠি দেবার থাকে।

তারিণীর কাছে কোন আশা ভরসা না পেয়েও সন্ধ্যা টাকাটা পাওয়া যেতেও পারে এই রকম একটু ভরসা দিয়ে দু'লাইন একটা চিঠি লিখে নিজেই গলির মোড়ে পাঁচুর হাতে দিয়ে আসে।

বলে, 'তুমি পরশু সকালে একবার এসো।'

'আমি পারব না আসতে।'

সন্ধ্যা তাকে আর কিছু বলে না। বলার দরকারও ছিল না। খামে আঁটা চিঠিতে সে পাঁচুকে পাঠাবার কথা লিখে দিয়েছে, তার মুখের উপর যাই বলুক পাঁচু, পরশু সকালে লেজ নীচু করে তাকে আসতেই হবে।

সন্ধ্যা এসেছিল সকালে। মাধবের বই-এর প্রুফ প্রেসে পৌছে দিয়ে পাওনা টাকা থেকে দুটি টাকা উসুল করিয়ে একতাড়া নতুন প্রুফ নিয়ে বিকালের দিকে নরেন আসে।

আজ আর প্রুফ দেখবে না। শুধু মন নয়, চোখও অস্বীকার করছে প্রুফ

দেখতে। সব চেয়ে ছোট ইংরাজী হরফে ঠাসবুনানি লাইনে ছাপা হয়ে বইটা বেরোবে—সাধে কি প্রুফ দেখতে দেখতে চোখ কট্ কট্ করে, বেশী খিদে পেলে চোখের সামনে অক্ষরগুলি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়!

সব শুনে নরেন বলে, 'ওই বলরামবাবু না কে, অশোককে উনি একটু পেয়ার করেন, না?'

'উনিই চাকরী দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পড়ে আর কি হবে?—চাকরীটা খালি হয়েছে, ঢুকে পড়।'

'তাই ভাবছিলাম। ছুতো না পেয়েই আমাদের তাড়ায়—চাকরী খসিয়ে একেবারে ফেলে দেবার এমন সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে!'

সন্ধ্যা কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলে, 'ওসব কথা শুনে কি হবে দাদা? তোমরা সবাই মিলে আমার একটা বিহিত কর?'

'বিহিত তো অশোকেরা করেই দিয়েছে। গয়না কেড়ে রেখে জন্মের মত বিদেয় করে দিয়েছে।'

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে। গা তার জ্বলে যায় নরেনের কাটা কাটা কথায়, কিন্তু চুপচাপ সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও তো তার নেই। সে আজ একূল ওকূল দু'কূল হারাতে বসেছে।

নরেন বলে, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছিস কিন্তু তোর এতটুকু বুদ্ধি বিবেচনা হয় নি সন্ধ্যা, একফোঁটা সাংসারিক জ্ঞান জন্মায় নি। ওরা বলতেই তুই ছুটে এসে আমাদের বলছিস বিহিত করতে! একলা সংসারটার বিহিত করে উঠতে না পেরে বাবার কি দশা হয়েছে দেখতে পাস না? আমি কাল সারাদিন চার পয়সার মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। ভাগ্যে বিকালে নন্দন গিয়ে হাজির হয়েছিল, আরও চারটি মুড়ি জুটল। চোখ টাটিয়ে প্রুফ দেখে দুটো টাকা নিয়ে এসেছি—দুটো দিন চলে যাবে।'

নরেন একটু থামে।

সে বুঝতে পারে কড়া ধমকের সুরে তাকে এসব কথা বলতে শুনে সন্ধ্যার মনে

আশা জেগেছে। সন্ধ্যা ভাবছে, টাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে হবে বলেই তার রাগ হয়েছে—এভাবে ধমক দিয়ে সে কথা বলছে।

নিজের বোকামি আর ভাবালুতার জন্য নরেন লজ্জা বোধ করে। সত্যই তো, বিপদে পড়ে যে এসেছে সাহায্যের জন্য তাকে ফাঁকা ভৎসনা আর উপদেশ দেওয়ার কোন মানে হয়?

নরেন শান্ত ও সংযত সুরে বলে, 'এটা বললাম আমার অক্ষমতার কথা। কিন্তু আমার যদি অনেক টাকা থাকত, টাকা দিয়ে তোর ফিরে যাবার বিহিত করার সাধ্য থাকত, তবু আমি এ বিহিত করতাম না।'

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট সুরে বলে, 'তোমার যদি অনেক টাকা থাকত, ওরাও কি এভাবে বিহিত করার জন্য আমায় পাঠাত, না পাঠালে আমিই তা সইতাম? নিজে এসে তোমার পায়ে ধরত।'

কড়া ঝাঁঝালো সুরে• বোনকে ধমকাতে সুরু করেছিল, এবার নরেন প্রায় কাতর কণ্ঠে কথা বলে।

'এর পরেও তুই ফিরে যাবি?'

'না গেলে তোমরা আমায় খাওয়াবে? আমার ছেলে দুটোকে মানুষ করবে?'

'আমরা কেন খাওয়াবো? নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করে নিবি। মামলা করে গয়না আদায় করবি, খোরপোষ আদায় করবি।'

সন্ধ্যা অবজ্ঞার সুরে বলে, 'তাই বল। এরকম ছেলেমানুষী বুদ্ধি না হলে তোমার আজ এ দশা হয়! একটা আইন থাকলেই বুঝি তা খাটানো যায়? এত আইন থাকতে এত বেআইনী কাজ তবে সংসারে ঘটছে কি করে?'

সন্ধ্যার কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়—কিন্তু নরেনও তো সত্য সত্যই তাকে আইনের সাহায্য নেবার কথা বলছিল না। সে আসলে তাকে বলছিল একটু শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা, চোখ কান বুজে সব সয়ে না গিয়ে একটু তেজ দেখাবার কথা।

সে বলে, 'আমার কথাটা তুই মোটেই বুঝলি না। আমি বলছি—পেটের

ভয়ে অন্যায়কে কখনো মাথা পেতে মানতে নেই। শেষ পর্য্যন্ত তাতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। ঝি-গিরি করেও যখন টিঁকে থাকা যায়—এত অপমান সইবি কেন?'

এবার সন্ধ্যা রেগে যায়।—'অন্যায়টা কিসের? আমার অপমান হল কাদের জন্য? ওর পাওনা টাকা তোমরা ওকে দেবে না—আদায় করতে চাইলে হবে অন্যায়। অন্যায় তো তোমাদের! তোমরা অন্যায় করেছ বলেই তো ওরা আমায় এভাবে ঝাঁটা মেরে পাঠাতে পেরেছে? স্বামীর জেলে যাওয়া ঠেকাবার জন্য চেষ্টা আমি করব না? এতে আমার কোন অপমান নেই—অপমান তোমাদের।'

'তবে আর বলার কি আছে!'

বোনের কাছে কথায় হার মানার এত লজ্জা এত ঝাল? ঝালটা একটু সয়ে এলে নরেন বুঝতে পারে, জ্বালাটা তার সন্ধ্যার কাছে কথায় হার মানার জন্য নয়—নিজের প্রাণের কাটা ঘায়ে নিজেই নুন ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য তার জ্বালা। এবারও সন্ধ্যা ওদের পক্ষ নিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে, এই বাস্তবতা তার অসহ্য ঠেকছে। বাস্তবতার কাছে এত ছেঁচা খেয়েও সে রয়ে গেছে এমনি অন্ধ নীতিবাগীশ!

কে জানে, সবটা না হলেও অনেকটাই হয় তো সাজানো ব্যাপার, বানানো কথা। আপিসের টাকা নিয়ে অশোকের বিপদে পড়ার কথাটা সত্য—কিন্তু গয়না কেড়ে নিয়ে বাপের কাছে টাকা আদায় না করে ফিরে যেতে বারণ করে সন্ধ্যাকে পাঠানোর কথাটা মিথ্যাও হতে পারে। অশোকের সঙ্গে পরামর্শ করেই হয় তো সন্ধ্যা এভাবে এসেছে—চাপ দিয়ে যাতে টাকাটা আদায় করা যায়।

নরেনকে দিয়ে সন্ধ্যাই নন্দনকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনে।

দোকানের কাজ সেরে নন্দন আসে রাত দশটায়।

বলে, 'খুব জরুরী ব্যাপার বলে এলাম, নইলে আসতাম না।'

'আসতে না মানে?'

'আসা উচিত হত না।'

'বুঝিয়ে বলো। এসেই দেখি ঝগড়া সুরু করলে!'

নন্দন শান্ত গম্ভীর গলায় বলে, 'সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলি, মনে লাগলে দোষ ধরো না। এসব কথা স্পষ্ট বলাই ভাল। এ অবস্থায় এসেছ—তোমায় এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। এসেই তুমি আমায় ডেকে পাঠালে—আমাকেও বাধ্য হয়ে রাত সাড়ে দশটার সময় আসতে হল। আমাদের ভাব ছিল, এ তো সবাই জানে। আমি একটা চাকরী পেলে অশোকের বদলে আমার ঘরেই তুমি আসতে। চাকরী না পেলেও আসতে,—যদি একটা চাকরে বাপ থাকত। এম.-এ তো পাশ করেছি অশোকের বি.-এ. ডিঙোনোর আগেই? অশোকও এসব কথা অল্প বিস্তর নিশ্চয় শুনেছে। এরকম অপমান হয়ে এসে তুমি এভাবে আমায় ডেকে পাঠালে - '

সন্ধ্যা ধৈর্য্য হারিয়ে বলে, 'বাবা রে বাবা, তোমাদের সকলের কি মাথা খারাপ হয়েছে? দাদা বললে ওরা অন্যায় করেছে, তোকে অপমান করেছে,—তুমিও সেই গাউনি গাইতে সুরু করলে! অন্যায় কার আমি জানি নে? আমার অপমান আমি বুঝি নে? ওদিকে ওরা কোন অন্যায় করে নি, আমায় কেউ অপমান করে নি।'

'তাই নাকি!'

'কি তবে? অপমান হয়ে এসেছি, গায়ের জ্বালায় তোমায় পিরীত করতে ডেকে পাঠিয়েছি—এসব কোন দেশী কথা? একদিন ভাব ছিল তো আজকে কি? আজ অন্যরকম ভাব।'

নন্দন বলে, 'ও! অন্য রকম ভাব।'

সন্ধ্যা জোর দিয়ে বলে, 'তা নয়? ভাব কি শুধু ওই এক রকমের হয়? স্নেহ মমতার সম্পর্ক নেই? বন্ধুতা নেই?'

নন্দন চমৎকৃত হয়ে শোনে।

এক ধমকে তাকে চুপ করে যেতে দেখে সন্ধ্যা প্রাথমিক জয়ের গর্বে একটু

হাসে। জয়যাত্রা এগিয়ে নেবার জন্য বলে, 'আমি তো'জানি তুমি আমার ভাল ছাড়া কখনো মন্দ চাইবে না। বিয়ে হয় নি বলে ভালবাসা তো মরে যায় না। দরদ· সবাই করে—কারো কম কারো বেশী। জানি তো তোমার দরদটাই সব চেয়ে খাঁটি? তাই ভাবলাম, বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক। তোমার কাছেই খাঁটি পরামর্শ পাব।'

শুনতে শুনতে নন্দনের মনে হয় আজ বুঝি সে প্রথম হদিস্ পেল রূপকথা আর কাব্য কথার আসল মানেব, আসল তাৎপর্য্যের। আজ বুঝি সে প্রথম টের পেল যে মহান রূপকথা আর মহৎ জীবন-কাব্যকে কি ভাবে পচিয়ে গলিয়ে ছেলে-ভুলানো মদ বানিয়ে ছেলেবেলা থেকে তাকে নেশায় বুঁদ করে রাখার চেষ্টা করে আসা হয়েছে।

এত বয়সেও, এম.-এ পাশ করে এতকাল বেকাবি করে আসার পরেও—বাস্তবতার কঠিন চিকিৎসায় নেশা কেটে যাওয়ার উপক্রম করলেও—ওই মদেব পিপাসা কেটে যায় নি, ওই নেশাকে দাম দিতে কুণ্ঠা হয় নি।

সব চেয়ে মজা এই, যাকে কেন্দ্র করে ওই নেশা চরমে তোলা সে-ই আজ তার নেশা কাটিয়ে দিব্যজ্ঞান এনে দিয়েছে।

নন্দনকে বড়ই লড়তে হয়েছে সারাদিন—বড়ই খাটতে হয়েছে। কত অপমান যে মাথা পেতে মানতে হয়েছে সকাল থেকে বাত পর্য্যন্ত একঘেয়ে ক্লান্তিকর খাটুনির সঙ্গে। এতদিন বেকার ছিল, নন্দন বুঝতে পারে নি তাদের মত তুচ্ছ মানুষের দায়ে পড়ে বেতন নিয়ে পরেব কাজ করা কী বিড়ম্বনা।

নরেন একদিন তার চাকরী পাওয়া ভাগ্যেব নিন্দা করেছিল—বন্ধুকে দীর্ঘকাল বর্জন করার অজুহাত দাঁড করিয়েছিল চাকরী পাওয়া।

শুনে তখন রাগ হয়েছিল নন্দনের। কাজ পেয়ে আজ সে বুঝতে পেরেছে নরেনের অভিযোগের মানে।

সারাদিন খেটে খেটে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ আর অপমানে অপমানে তিতো বিবক্ত মন নন্দনের বিগড়ে যাবে তাতে আশ্চর্য্য কি?

এ অবস্থায় নিষ্ঠুর কঠোর এক অন্যায় প্রতিশোধের ঝোঁক চাপলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কোন নীতিতে ?

সে তো মানুষ ?

রক্তমাংসের মানুষ ?

মানুষের মত বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ ?

স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যার চোখে চোখে তাকিয়ে ধীর গলায় নন্দন বলে, 'তুমি আমায় মুস্কিলে ফেলে দিলে সন্ধ্যা।'

তার ভাবান্তর দেখে সন্ধ্যার জয়ের গর্ব্ব খানিকটা উপে যায়, একটু ভড়কে গিয়ে সে বলে, 'মুস্কিলে ফেলে দিলাম ?'

'তোমায় আজও আমি ভালবাসি। এ জীবনে আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। তোমার জন্য রাত্রে আমার ঘুম হয় না।'

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে।

নন্দন বুঝতে পারে সন্ধ্যা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ভাল লাগত বলেই স্কুলের মেয়ে সন্ধ্যা কলেজের ছেলে তার সঙ্গে খেলা করত বটে কিন্তু সাড়া কি আর একেবারেই জাগত না তার হৃদয়ে ? আজ শুকনো নীরস হয়ে গেছে সে হৃদয়—ভয়ে তাই সে চুপ করে আছে যে কথা বলতে গেলে পাছে নন্দন সেটা টের পেয়ে যায় !

নন্দন গলা থেকে আবেগ বিসর্জন দিয়ে বলে, 'জানো তো তোমার জন্যেই এত কষ্ট এত নির্য্যাতন সহ্য করে এম-এ পাশ করেছিলাম ? তোমার জন্যে না হলে কবে এদিকে ওদিকে কোন একটা ছুটকো কাজ নিয়ে কেটে পড়তাম। যা পেতাম তাতেই বেশ বগল বাজিয়ে স্ফূর্তি করে দিন কাটাতাম।'

সন্ধ্যা ভয়ে ভয়ে বলে, 'পাশ করেও তো দেড় বছর কোন চাকরী জোগাড় করতে পারলে না। নইলে—'

নন্দন বলে, 'তোমার জন্য মরি বাঁচি পণ করে এম-এ পাশ করলাম—পাশ

করার জন্তেই সহজে চাকরী পেলাম না। আজে বাজে চাকরী তো করতে পারি না এম-এ পাশ করে? ম্যাট্রিক পাশের সঙ্গে তো কম্পিট করতে পারি না? তাই ধৈর্য্য ধরে থাকতে হল।'

সন্ধ্যা চুপ করে শোনে।

'ধৈর্য্য না ধরতে পারলে কি এরকম চাকরীটা বাগাতে পারতাম? চারটে কারবার রাধারমনের, বছরে আট দশ লাখ টাকা আয়—একটা চিঠি লিখতে পর্য্যন্ত আমার পরামর্শ চায়।'

ছাই-এর মত বিবর্ণ দেখায় সন্ধ্যার মুখ।

নন্দন মমতা বোধ করে। বড়ই মমতা বোধ করে—স্কুলের বয়স থেকে যার জন্য মমতা বোধ করতে করতে প্রেম জন্মে গিয়েছিল—অল্প বুদ্ধিতে ভাল না বেসেও ভালবাসার ভাণ করে সে তাকে খেলিয়েছে বলেই কি তার জন্য মমতা বোধ না করে পারা যায়?

সে তো রক্তমাংসের মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মায়া মমতার জগতে তো তার বাস।

কিন্তু এমনি প্রচণ্ড ঝোঁক তার এসেছে অন্যায় প্রতিশোধ নেবার যে ওই মমতার বাধা ঠেলে সে বলে, 'তাই বলছিলাম, মুস্কিলে ফেলে দিলে। মুস্কিলটা কি জানো? পাঁচ শো টাকা চাপ দিয়ে যখন ইচ্ছা আনতে পারি, ভীষণ বিপদের কথা বানিয়ে বলছি বুঝলেও ওরা টাকাটা দেবে—আসল বিপদ গোপন করে একটা বিপদের অজুহাত দিয়ে চাইছি জেনেই দেবে। অবশ্য সুদে আসলে ঢের বেশী আদায় করে নেবার জন্তেই দেবে—কিন্তু দেবে।'

সন্ধ্যা পাংশু মুখে চেয়ে থাকে।

'আমি কারো জন্য এভাবে টাকা নিতাম না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তোমার জন্য ব্যবস্থাটা করতেই হবে। সেইজন্য বলছিলাম আমাকে তুমি বড় মুস্কিলে ফেললে।'

নরেন আগেই টের পেয়েছিল, তার সঙ্গে সন্ধ্যায় কতাবার্তা বলার পরিপূর্ণ

সুযোগ দেওয়ার জন্যই এ ঘরটাকে যেন আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এতগুলি মানুষের দুটি ঘরের সংসার থেকে!

বড় কঠিন সমস্যার ভার নিয়ে জীবন সমুদ্রে ডুবতে বসে সন্ধ্যা তাদের ঘাড়ে চেপে তাদেরও ডুবোতে এসেছে।

বড় মহাজনের কাছে চাকরী করছে নন্দন। একদিন সন্ধ্যার সঙ্গে ভাব ছিল নন্দনের, ভালবাসা ছিল।

নন্দনকে অবলম্বন করে ফাঁড়া কাটাবার উপায় করে তাদের যদি রেহাই দিতে চায় সন্ধ্যা—তাদের দুজনকে নিরিবিলি আলাপ আলোচনার সুযোগ করে দিতে হবে বৈকি।

খানিকক্ষণ চুপ চাপ থেকে সন্ধ্যা জোর দিয়ে একটু কড়া সুরেই বলে, 'তোমায় মুস্কিলে ফেললাম? তবে থাক্!

'থাকবে কেন? আমাকে মুস্কিলে ফেলার অধিকার তোমার না থাকলে কার আছে?'

সন্ধ্যা নরম সুরে বলে, 'রাত হয়েছে, সারাদিন খেটেছ খুটেছ, এবার বরং তুমি বাড়ীই যাও।'

তখনও হয় তো নিজেই প্রতিশোধের ঝোঁকটা সামলে ফিরে যেতে পারত নন্দন, ফিরে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত সন্ধ্যার বিপদ ঠেকাতে—কিন্তু সন্ধ্যার কথা বলার ভঙ্গিটা তার ঝোঁকটাকেই আরও চড়িয়ে দেয়।

'ভাবছ কেন? কাল আমি সব ঠিক করে দেব। কাল যদি না তোমায় আমি নোটের তাড়া—'

কথা শেষ না করেই নন্দন দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে ছবিরাণীতে ঠোক্কর খায়!

এত রাত্রে ঘুমন্ত পুরীতে—কে জানে ঘুমন্ত কিনা?—ছবিরাণীতে ঠোক্কর খেয়ে নন্দন পরম স্বস্তি বোধ করে।

তার সমগ্র সত্তা তখন উত্তর চাইছিল : এ কি প্রতিশোধ ? অথবা অশোক যেমন ভাবে ঠকিয়ে আসছে বেচারা সন্ধ্যাকে—সেও তেমনিভাবে ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তেমনিভাবে ঠকাতে চায় ?

'তুই এখানে কি করছিস ?'

বাড়ীর মানুষ কেউ কোথাও নেই, ছবিরাণী বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে—একা।

ছবি বলে, 'এত রাত্রে তুমি এবাড়ী এলে—কি হয়েছে না হয়েছে কিছু বলে এলে না। আমি ভাবলাম ভয়ানক কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। তাই তোমাব পিছু পিছু চলে এলাম।'

সন্ধ্যা নিশ্চয় দেখেছিল ছবিরাণীকে। তাই নোটের তাডা নিয়ে পবদিন আসবার কথা বলতে বলতে চৌকী থেকে উঠে তাকে দরজা বন্ধ করতে আসতে দেখেও কথাটি বলে নি। দেহমন কুঁকড়ে যেতে চায় লজ্জা ঘৃণা আর আত্ম-ধিক্কারে। এতদিনের লড়াই করে বজায় রাখা পৌরুষ যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

রক্ষণাবেক্ষণ সন্তানপালন ভরণপোষণ সব বিষয়ে পুরুষানুক্রমে মেয়েদেব মুখাবলম্বিনী করে রেখে এসে পুরুষ জাতের আত্মকলহে হার মানাব ঝাল পুরুষ হয়ে আজ সে ঝাড়তে যাচ্ছিল উপায়হীনা উন্মাদিনী সন্ধ্যার উপর !

তার নিজের ছেলেমানুষী স্বপ্ন তারই ইচ্ছায় তারই চেষ্টায় গডতে দিয়েছিল বলে—গড়তে দিয়ে কাপুরুষ তার জীবন-বিরোধী আত্মনাশকে, দু'দিনেব স্বেচ্ছাচারিতাকে. স্বীকার করে নি বলে—পুরুষের গুণ্ডামির অধিকাব খাটিয়ে সে প্রতিশোধ নিতে চাইছিল সন্ধ্যার উপর।

অপেক্ষমানা বোনের ঘাড়ে হোঁচোট না খেলে সন্ধ্যাকে ভেঙ্গে চুরমাব কবে কে জানে কি ভাবে নন্দন জের টানত সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার।

খাঁটি আত্মধিক্কারে খাঁটি দায়িত্ববোধে তার যেন আত্মকেন্দ্রিকতার লজ্জা ভয় গ্লানিবোধ দূর হয়ে যায়।

গলা চড়িয়ে সে ডাকে, 'কাকীমা ? উষা ? বরেন ?'

ছবিরাণী চাপা গলায় বলে, 'কি পাগলামি করছ? চলো না আমরা বাড়ী ফিরে যাই?'

'দাঁড়া। এদের সঙ্গে কথা বলে নিই?'

'কার সঙ্গে কথা বলবে? ওরা কেউ বাড়ী আছে নাকি? শুধু তারিণী কাকা—কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বুড়ো মানুষকে ডেকো না।'

'সবাই গেছে কোথায়?'

'সেই মামার বাড়ী—নরেনদা'কে যে চাকরী দিয়েছিল। তার ছোট মেয়েব বিয়ে। তারিণী কাকার শরীর ভাল নয় বলে যান্ নি।'

সন্ধ্যার কথা সে উল্লেখও করে না। সন্ধ্যা কেন মামাতো বোনের বিয়েতে সকলেব সঙ্গে যায় নি বলা সে বোধ হয় প্রয়োজন মনে করে না।

নন্দন ভাবে, তাদের নিবিবিলি কথা বলার সুযোগ তবে কেউ করে দেয় নি—স্বাভাবিক কারণেই বাড়ীটা শূন্য হয়ে আছে।

'তারিণী কাকাকেই বলে যাই কথাটা।'

তাব প্রথম হাঁকেই তারিণীব ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঘরে আলো জ্বেলে চোখে চশমা আঁটতে সে বাইবে আসে।

নন্দন বলে, 'আপনি আবাব উঠলেন কেন? আমি ঘরে গিয়ে কথাটা জানাতে পাবতাম।'

তারিণীর গলা কেঁপে যায়।—'কি কথা বাবা?'

নন্দন সোজা স্পষ্ট ভাষায় তারিণীকে বলে, 'এ রকম বিপদে পড়ে এসেছে—সন্ধ্যাকে কালকেব মধ্যে পাঁচশো টাকা যোগার কবে দিতেই হবে। নরেনের সঙ্গে কথা বলেছি, নরেনও সায় দিয়েছে। পাঁচশো টাকার জন্য—'

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে দেখে নন্দন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নন্দন দ্বিধাহীন জোর গলায় ঘোষণা করে, 'নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করেছি কালকেই টাকার ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারব। কালকেই সন্ধ্যা অশোকের সমস্ত পাওনা টাকা নিয়ে ফিরে যাবে।'

সন্ধ্যা কেবল একটি প্রশ্ন করে, 'দাদার সঙ্গে আগেই তোমার টাকার কথা হয়েছিল? দাদাকে বলেছিলে কি ভাবে টাকা যোগাড় করবে?'

'বলেছিলাম।'

এই সান্ত্বনাটাই অবশিষ্ট আছে নরেনের। এখানে এসে সন্ধ্যার উপর প্রতিশোধ নেবার ঝোঁক চাপার অনেক আগেই সে ঠিক করে ফেলেছিল রাধার মনের কাছ থেকে টাকা ধার করে সন্ধ্যাকে বাঁচাবে।

এত রাত্রে ছবিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে এত কাণ্ডের পর।

কে জানে ছবিরাণী কি ন্যাকামি জুড়বে, কি ভাবে তাকে জানিয়ে দেবে যে আজ থেকে ছোড়দার জন্য, তার এম-এ পাশ করা শিক্ষিত ছোড়দার জন্য যেটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালবাসা তার ছিল সব শেষ হয়ে গিয়ে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার স্থান দখল করেছে।

হয় তো সারা পথ একটি কথা না বলে সে তার এই মনোভাবটা জানিয়ে দেবে।

পথে নেমে চলতে আরম্ভ করে ছবিরাণীর প্রথম কথাতেই সে তাই চমৎকৃত হয়ে যায়।

ছবিরাণী পথে নেমেই বলে, 'সন্ধ্যার বিপদে তুমি পাঁচশো টাকা যোগাড় করার ভার নিতে পার। আমার সর্ব্বনাশটা দু'এক মাস ঠেকাবার জন্যে কিছু করতে পার না। মায়ের পেটের বোন তো নই, করবে কেন!'

চমৎকৃত নন্দন বলে, 'তুই নিজেই তো বলেছিস শুনলাম ভালবাসায় পেট ভরে না। বেকারের চেয়ে তোর চাকরে বর ভাল।'

'মুখে একটা কথা বললেই বুঝি সেটা প্রাণের কথা হয়? ভুল বুঝে কেউ বুঝি কোনদিন ভুল কথা বলে না? সেটাই শেষ কথা ধরে নিতে হবে!'

'ভুলটা স্বীকার করে কথা বলে এলেই চুকে যায়।'

'ছেলেবেলা থেকে ছেঁচা খেয়ে খেয়ে মানুষ হয়েছ, তুমি বুঝবে না। মেয়েরা ভুল স্বীকার করতে গেলেই অন্য মানে দাঁড়িয়ে যায়।'

'তোদের মন বড় বাঁকা।'

একেবারে নির্জন নয় পথ। সহরের কোন পথ বোধহয় কখনো একেবারে নির্জন হয় না।

দু'চারজন লোক, কয়েকটা পশু পথকে একেবারে নির্জন হতে দেয় না।

ছবিরাণী দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে চলে, 'তোমরা পুরুষরাই আমাদের এ দশা করেছ। মুখ খুলে কিছু বলা, নিজে থেকে কিছু করা, আমাদের বারণ। ভুল করেছি বলতে গেলে তোমার বন্ধু কি ভাববে জানো? চাকরে ছেলেটা ফসকে গেছে, হাতের পাঁচ হিসেবে ওকে হাতে রাখতে চাইছি।'

নন্দন হাই তুলে বলে, 'চাকরে ছেলেটাকে ফসকে দেবার কথাই তো আমাকে বলছিস তুই?'

'বলছিই তো। সর্ব্বনাশটা ফসকিয়ে দাও। তাই বলে ভুল স্বীকার করতে যাব নাকি আমি? তা কখনো যাব না। তুমিও কিছু বলতে যাবে না। ভাববে তোমায় দিয়ে আমিই বলাচ্ছি। চাকরী পেয়েছ, বাকী জীবনটা নয় তোমার সংসারেই দাসী হয়ে থাকব। তোমার বন্ধু আসতেও তো পারে একবার? এলে তখন ভুল স্বীকার করব—জানবে যে আমি সস্তা নই।'

'আমার ঘুম পেয়েছে ছবি। খিদেও পেয়েছে। চল্ বাড়ী যাই।'

রাস্তার আলোতেই বোঝা যায় অপমানে কালো হয়ে গেছে ছবিরাণীর মুখ। চলতে আরম্ভ করে সে বলে, 'তুমি ছোটলোক বনে গেছ ছোড়দা'।'

১০

একটা ইণ্টারভিউ ছিল। কিছু হবে না জেনেও নরেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে যায়।

সামান্য চাকরী, তারই জন্য প্রার্থীর কি ভীড়! কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার পরেই জানিয়ে দেওয়া হল যে একজনকে বহাল করা হয়েছে, তাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

নরেন একজনের মন্তব্য শোনে, 'আজকের জন্য কি আর বাকী ছিল বাবা, বহাল আগেই হয়ে গেছে। ঘরের লোককে বহাল করবি এতো জানা কথাই বাবা, মিছিমিছি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঁদর নাচিয়ে পয়সা খসিয়ে হয়রাণ করিস্ কেন?'

আরেকজনকে সে বলতে শোনে, 'জানি তো কিছু হবে না তবু কেন লোভ দেখাস? ট্রামবাসের পয়সাটাও তো নষ্ট করালি?'

ট্রাম বাসের পয়সা! ট্রামবাসের পয়সাও নরেনের পকেটে আজ নেই। হাঁটতে হাঁটতে বস্তির ঘরে ফিরতে হবে!

তার বস্তির ঘর অনেক দূর। যে প্রেসে মাধবের বই ছাপা হচ্ছে সেটা কাছেও বটে, একটু ঘুর হলেও তার বস্তিতে ফেরার পথেও বটে।

টিকিট না করার কায়দায় গোটা দুই তিন ট্রামে ওঠা-নামা করে প্রেসে পৌছানো যাবে, হাঁটতে হবে না।

নরেন ট্রামের ফার্স্ট ক্লাশে উঠে গম্ভীর মুখে গদি আটা আসনে বসে। পকেটে যার রেস্ত নেই একটি পয়সাও, টিকিট করবে না ঠিক করেই যে গাড়ীতে উঠেছে, তার আবার ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড ক্লাশের হিসাব কিসের।

দুপুর বেলা, গাড়ীতে লোক কম। ভীড় থাকলে কণ্ডাক্টরের টিকিট চাইতে দেরী হত, বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া চলত—এখন উঠে বসার একটু পরেই কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চায়।

'পয়সা নেই ভাই।'

কণ্ডাক্টরের বয়স অল্প—বোঝা যায় অল্প দিন কাজে ভর্তি হয়েছে। ওদিকের কণ্ডাক্টরটি প্রৌঢ়বয়সী।

কয়েক মুহূর্ত নরেনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে নীচু গলায় বলে, 'আমি জোর গলায় নেমে যেতে বলব—নামবেন না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবেন।'

'বুঝেছি।'

ওঠানামার প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়ে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টর বলে, 'পয়সা নেই তো উঠেছেন কেন? নেমে যান।'

নরেন বলে, 'ভদ্রলোকের ছেলে, পকেটে পয়সা নেই বললাম, তবু একেবারে নামিয়ে দেবে?'

'কি করব বলুন? ডিউটি করতে হবে তো?'

'শুধু বিলাতী কোম্পানীর ডিউটি করবেন? একজন মুস্কিলে পড়েছে তার জন্য কোন ডিউটি নেই?'

ওদিকের কণ্ডাক্টর বলে, 'নেমে যান না মশায়?'

কিন্তু নরেন তখন বুঝে গিয়েছে ওদের ডিউটি করার মানে—টিকিট যখন করনি, কড়া সুরে তোমায় নেমে যেতে ওদের বলতেই হবে। তাতে যদি অপমান বোধ হয় নেমে যাবে! নইলে ওটুকু সয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।

কে বলতে পারে, হয় তো বেশ কয়েকটা পাশ দিয়েও হতে হয়েছে ট্রামের কণ্ডাক্টর— ভদ্রঘরের ছেলেদের অবস্থা ওর অজানা নয়।

বেশ বড় এবং আধুনিক প্রেস। ম্যানেজার হিরণ্ময় মাঝবয়সী হাসিখুসী মানুষ, কাজের লোক। তার চেষ্টাতেই প্রেসের অনেক উন্নতি হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করে, 'কি খবর নরেন বাবু?'

নরেন বলে, 'আমার কিছু পাওনা নেই, না?'

সে জানে জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য, পাওনা তার কিছুই নেই। হিরণ্ময় বলে, 'আপনি তো ফর্মা রেডি করে দিচ্ছেন, আর টাকা নিয়ে যাচ্ছেন।'

'একটা চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, নইলে একটা ফর্মা রেডি করে আনা যেত। আমায় দুটো টাকা আগাম দিন—পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।'

হিরণ্ময় কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি অন্য কোন কাজ করেন না?'

'কাজ পেলে তো করব?'

'আপনার প্রুফ দেখা খুব ভাল হচ্ছে। তবে দেখেই বোঝা যায় প্রফেশন্যাল নন—ধরে ধরে আস্তে আস্তে ছ্যাখেন।'

'দেখা প্রুফে বানান ভুলটুল পাবেন না, লেখাপড়াটা ভাল করেই শিখেছিলাম। কিন্তু অভ্যাস নেই, দেখতে বেশী সময় লাগে। তবে বেকার মানুষ, সময়ের কোন অভাবও নেই।'

হিরণ্ময় একটু ভেবে বলে, 'আপনি আরও দু'একখানা বইয়ের প্রুফ ছ্যাখেন না কেন? সামান্য হলেও আয় তো।'

'দিন না ব্যবস্থা করে?'

নরেন ভাবে, সত্যি, কি যান্ত্রিক হয়ে গেছে তার মন, এ কথাটা একবার খেয়ালও হয় নি! প্রুফ দেখাও যে একটা কাজ, সে কাজ করলে যে দু'চারটে টাকা মেলে, আগে খেয়াল না হলেও মাধবের বইয়ের প্রুফ দেখে দিয়ে পয়সা পাবার পরেও মনে হল না যে আরও দু'চার খানা বইয়ের প্রুফ সে অনায়াসে দেখে দিতে পারে!

হিরণ্ময় বলে, 'তা দু'একখানা দিতে পারি। তবে এ বইয়েব চেয়ে রেট কিন্তু কম হবে—ওগুলি সাধারণ বই।'

নরেন বলে, 'বেশ তো, রেট কম হোক। দু'একখানা কেন, দু'চারখানার

ব্যবস্থা করে দিন না? পরীক্ষার জন্য মাসের পর মাস দিনরাত পড়েছি—পয়সার জন্য নয় তেমনি ভাবেই খাটব।'

হিরণ্ময় একটু হেসে বলে, 'কি জানেন, এ বড় এলোমেলো কাজ। কখনো হয় তো একসঙ্গে তিনচারখানা বই পাবেন, কখনো হয় তো একখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

'মিনিমাম একখানা হাতে থাকবে ধরে নিতে পারি তো?'

'তা ধরে নিতে পারেন। কিন্তু একটা বইয়ের প্রুফ দেখে কত আর পয়সা পাবেন?'

দিন চারেকের মধ্যে হিরণ্ময় তাকে একটি ইংরাজী পাঠ্য পুস্তক এবং একটি বাংলা উপন্যাসের প্রুফ দেখার কাজ জুটিয়ে দেয়।

পুরো একটা দিন ভাববার সময় নিয়ে নবেন বলে, 'আমি তো চললাম রে মন্টু।'

'কোথা যাবেন?'

বাড়ী ফিরে যাব।'

দীননাথ খুসী হয়ে বলে, 'এ ভাল বুদ্ধি করেছেন। আপনজনার 'পরে কদিন রাগ রাখা যায়?'

'রাগের কথা নয় হে দীননাথ—বিচার বিবেচনা।'

নবেনের হিসাব খুব সোজা। এখানে থাকলে চাকরী বাকরীর খোঁজ খবর পাওয়ার বড় অসুবিধা। বাড়ী ফিরে যাবার উপায় থাকতে এখানে দু'টাকা ঘর ভাড়াই বা কেন গুণবে? উষার মুখ দিয়ে সকলে তাকে যে অনুরোধ জানিয়েছিল, এখন সেটা রাখা যায়। বাড়ীর লোকের উপর সে অবশ্য এতটুকু ভার চাপাবে না—বাড়ীর মানুষ খাবে আর তাকে উপোস করতে দেখবে, এ অসুবিধা মোটামুটি দূর হয়েছে। নিজে বেঁধে খাবে—দু'একবেলা উপোস দেবার দরকার হলে বাড়ীর লোককে জানালেই চুকে যাবে যে সে বাইরে খেয়ে এসেছে।

মা থাকতে বোন থাকতে, দুবেলা রান্নার ব্যবস্থা চালু থাকতে সে ভিন্ন রান্না করবে—এটা কটু লাগবে সকলের। কিন্তু নরেন জানে, কটু লাগবে শুধু গোড়ার কয়েকদিন, তারপর সয়ে যাবে। নিজে রেঁধে খাক, শাক ভাত খাক, নিজের রোজগারে সে যে খাচ্ছে এতেই খুসী থাকবে বাড়ীর লোক।

আশা করবে সুদিনের।

আপশোষও করবে। এত লেখাপড়া শিখে সংসারের জন্য কিছুই সে করতে পারে না—এ আপশোষ ঘুচবার নয়। তবে এ আপশোষের ঝাঁঝ তার তেমন আর লাগবে না, সহ্য হয়ে গেছে।

একসঙ্গে কয়েকটা বইয়ের প্রুফ দেখার সুযোগ পেলে নিজে কষ্ট করে থেকে দু'পাঁচ টাকা মাঝে মাঝে হয় তো দিতেও পাবে সংসারে।

বাড়ী ফিরবে ঠিক করে নরেন ভাবে, কই খুসী হওয়া তো গেল না? প্রাণের জ্বালা তো কমল না?

নিজের প্রাণকেই সে যেন বলে, খুসী হওয়া যায় কি? তোমার জ্বালা কমে কি? কোনমতে ঠেক্‌না দিয়ে টিঁকে থাকা কি মানুষেব জীবন যে খুসী হওয়া যাবে, জ্বালা জুড়োবে?

তল্পিতল্পা গুটিয়ে নরেনকে বাড়ী ফিরতে দেখে সকলেই খুসী হয়।

এতদিন দেখা করতে এলে সকলে তার কাছে অপরাধী সেজে থেকে যেরকম আড়ষ্টভাবে কথাবার্তা বলত, বাড়ী ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে তাব অনেকখানিই যেন উপে যায়!

এটাও হিসাব করেছিল নরেন। ভিন্ন রেঁধে খাক, এক বাড়ীতে এক সঙ্গে বাস করার জন্যই সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসবে সকলের ব্যবহার।

তাকে রান্নার আয়োজন করতে দেখে উষা হাসি মুখে খুসীর সঙ্গে বলে, 'উপোস ঠেকানোর ব্যবস্থা করে এসেছ জানি! নইলে তুমি আসতে না।'

তারপর বলে, 'আমি রেঁধে দিলে কোন দোষ আছে?'

নরেন একটু ভেবে বলে, 'একটা কথা মেনে নিলে দোষ নেই।'

'কি কথা বলো।'

'ঘাস পাতা যা রাঁধতে দেব, মুখ বুজে রেঁধে দেবে। এই দিয়ে কি করে খাব, এতটুকুতে কি করে পেট ভরবে, এসব দরদের কথা মুখে আনতে পাবে না।'

উষা স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'তাই হবে। ভেবেছ পারব না? দেখে নিও—আমি তোমারি বোন!'

মাধবের সঙ্গে নরেনের দেখাসাক্ষাৎ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বইটা উপলক্ষ করে নয়, মাধব তাকে আরেকটা কাজ দিয়েছে বলে।

মাধব তাকে একদিন বলে, 'বই ছাপাতে হেল্‌প করে মজুরি নিতে অপমান বোধ করেন নি বলেই সাহস করে বলছি। পয়সা নিয়ে অন্যভাবে আমাকে একটু হেল্‌প করুন না?'

'বলুন।'

'কতকগুলি কাজ আছে যাতে অনেক সময় চলে যায় অথচ আমি নিজে না করলেও চলে, অন্যে করে দিতে পারে। যেমন ধরুন, একটা পারটিকুলার পয়েন্ট নিয়ে একটা বই-এ কোথায় কি বলা হয়েছে জানতে চাই, বইটা আমার পড়ার দরকার নেই। কিন্তু আমাকে বইটা আগাগোড়া ঘাঁটতে হয়। এরকম আরও কতগুলি কাজ আছে, আপনি যা অনায়াসে করে দিতে পাবেন। একটা কোটেশন চাই, কতকগুলি ফ্যাক্‌স অ্যাণ্ড ফিগারস্ চাই—'

মাধব থামতেই নরেন বলে, 'কাজ বুঝেছি—তারপর বলুন।'

'পুরো মাইনে দিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া, দু' দিন হয় তো এমন কাজ করব যে এরকম হেল্‌প মোটেই দরকার হবে না। আপনি যদি সপ্তাহে তিন দিন কি চার দিন আসেন, দু'তিন ঘণ্টা আমার এই কাজগুলি করে যান—'

'কিন্তু কি করে তা হবে? আপনার এখুনি একটা কোটেশন দরকার, আমি হয় তো পরদিন আসব—আমার জন্য কাজ বন্ধ করে বসে থাকবেন?'

মাধব একটু হাসে।—'এমন জড়ানো জটিল কাজ আমার, এতদিকে এতরকম পড়া আর চিন্তা করা দরকার যে একটা কোটেশনের জন্য সাতদিন অপেক্ষা করতে হলেও আমার আসবে যাবে না। ওদিকটা স্থগিত রেখে অন্যদিকের কাজ চালিয়ে যাব—সোজা কথা।'

'এবার বুঝেছি। তারপর বলুন।'

মাধব বলে, 'আপনার এই কাজের দাম কিভাবে দেব, আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। অন্য কেউ হলে আলাদা কথা ছিল, আপনার আমার মধ্যে সেরকম সম্পর্ক নয়। বেকার বলে আপনাকে দয়া করা হবে না, আপনিও ভাবতে পারবেন না খাটিয়ে নিয়ে ঠকাচ্ছি।'

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

একি সেই মাধব? জ্ঞানের বিষয়ে ছাড়া, থিয়োরি নিয়ে ছাড়া যে সাধারণ ব্যাপারে ছেলেমানুষের মত উল্টোপাল্টা এলোমেলো কথা বলত? সে আজ এমন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছে, তার মান ও নিজের প্রয়োজন বাঁচিয়ে এমন সুন্দর ভাবে প্রস্তাবটা পেশ করছে!

মাধব একটা হাই তোলে। বেচারা শ্রান্ত বৈ-কি—ক্লান্ত না হলেও। বসে বসে এমন একটানা মাথার খাটুনি—এদিকে ছেলেমেয়ের দায়—ওদিকে কেড়ে নেওয়া চাকরীটা উদ্ধারের জন্য লড়াই!

অনেকের সমর্থন পেয়েছে, অন্যায় বরখাস্ত বাতিলের লড়ায়ে মাধব খুব সম্ভব জিতে যাবে।

চাকরী হারিয়ে মানসীকে হারিয়ে কত হিসেবী হয়েছে মাধব, কত সজাগ হয়েছে তার বাস্তববোধ! তার পরের কথাগুলি শুনে নরেন সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

মাধব বলে, 'ভেবে চিন্তে আমি একটা নিয়ম ঠিক করেছি। পছন্দ না হলে বলবেন কিন্তু। আপনি যতক্ষণ কাজ করবেন, একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসারের বেতনের হিসাবে আপনার কাজের ঘণ্টা ধরে দাম দেব। আসা যাওয়ার ফেয়ার দেব আর একটা টিফিন দেব।'

বলেই মাধব সুর পালটে জোরের সঙ্গে বলে, 'আপনি এমনি এলেন, কাজ শেষ করে দু'ঘন্টা গল্প করলেন তর্ক করলেন—সেটা ধরব না কিন্তু। ওটা আমাদের বন্ধুত্বের হিসাব! রাজী তো?'

'রাজী বৈ-কি!'

নিয়মিত আসে যায়, বেতনভোগী সহকারীর মত কাজও করে আবার বন্ধুর মত তর্কও চালায় কিন্তু মাধব যেন একেবারে বদলে গেছে, একেবারেই যেন বদলে গেছে তাদের তর্কের ধারা।

অনেক রকম অনেক কথা মাধব বলে। মানসীর কথা কিছুই বলে না মাধব। একবার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করে না।

শুভা চা দেয়, এটা ওটা যোগায়, ছেলেমেয়েকে সামলায় আর রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ঘরে চলে যায়।

মাধবের গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় অনায়াসে নির্ভয়ে দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করে।

মাধব খেঁকিয়ে ওঠে না! বিরক্ত পর্য্যন্ত হয় না! ধীর শান্তভাবে তার জিজ্ঞাসার জবাব দেয়!

মাধবের এরকম মশগুল অবস্থায় জরুরী ব্যাপারেও মানসী তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেত না!

বিয়ে করা বৌ-টার চেয়ে, ছেলেমেয়ের মা-টার চেয়ে, মাইনে করা রাঁধুনীকে সে বেশী সম্মান করে, রাঁধুনীর সঙ্গেই তার ভাল বনে।

একথাটা মনে হবার জন্য দু'একদিনের মধ্যেই নরেন নিজের কাছে বড় লজ্জা পায়। সে প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর কোন দিন কোন মানুষ সম্পর্কে সাত তাড়াতাড়ি এরকম সস্তা সমালোচনা খাড়া করে নিজেকে ছোট করবে না।

মানসীর কথা সে উল্লেখ পর্য্যন্ত করত না বলে নরেন ভাবত, শুধু লজ্জা নয়, এও মাধবের একটা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষণ।

মানসীকে একেবারে সে মুছে দিয়েছে মন থেকে।

তাই, জরুরী কাজ ধামা চাপা দিয়ে মাধব সেদিন নিজে থেকে মানসীর কথা তুললে নরেন প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, তারপর মানুষটা সম্পর্কে নিজের অনুদার মনোভাবের জন্য নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

মাধব বলে, 'মানসীর একটা চিঠি পেয়েছি নরেনবাবু। কি জবাব লিখব ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমি একরকম ভেবে এক কথা লিখব, উনি আরেকরকম মানে করে আরও চটে যাবেন। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক।'

মাধব একটু হাসে।

'এ কাজটা কিন্তু বন্ধু হিসাবে করবেন, দাম পাবেন না।'

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

মানসীর চিঠি পেয়ে, চিঠির জবাব লেখার জন্য তার পরামর্শ দাবী করে, সহজ-ভাবে হাসিমুখে এরকম মার্জিত রসিকতাও মাধব করতে পারে এই অবস্থায়!

নরেন বলে, 'দাম পাব না মানে? দাম তো আগাম পেয়ে গেলাম! স্ত্রীর চিঠির জবাব লিখতে আমার পরামর্শ দামী ভাবছেন!'

মাধব বলে, 'কি জানেন, এসব সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটাই, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটানোর সময় কই? কি দরকার মাথা খাটাবার? মানসী তো শুধু ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে পড়ে থাকার ব্যবস্থা চায়, সে ব্যবস্থা তো করেই দিয়েছি। আর কিছু ভাববার তো নেই আমার!'

নরেন বলে, 'এ পর্য্যন্ত বুঝলাম। বৌদি কি কি লিখেছেন না বললে এর পর যা বলবেন কিছুই বুঝতে পারব না।'

টেবিলে বুক সেলফে তাকে আলমারিতে স্তূপাকার বই, টেবিলেও গাদাগাদি করা কাগজ পত্র বই খাতা।

গেঞ্জির মত ব্যবহার করার জন্য পাতলা কাপড় দিয়ে ঘরের কলে মানসীর

সেলাই করা জামাটার বুক পকেট থেকে মানসীর চিঠিটা বার করে মাধব নরেনের হাতে দেয়।

তিন লাইন চিঠি।

স্বামীর কাছে একজন স্ত্রী ও মা'র চরম রকম গম্ভ ভাষায় লেখা চিঠি।

দু'পয়সার পোস্টকার্ডে লেখা।

"প্রিয়তম,

আমি ভাল আছি। ছোটকু ভাল আছে। ইলা খোকনদের একটা দিনের জন্য পাঠাতে পার? বড়ই মন কেমন করছে। একটা দিনের জন্ত ওদের পাঠাতে পারলে ভাল নয়। ভালবাসা নিও।

ইতি তোমার মানসী।"

চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে নরেন বলে, 'এতো বৌদির চিঠি নয়।'

'মানসীর হাতের লেখা।'

'হোক না বৌদির হাতের লেখা। হাত কি লেখে? মন যা হুকুম দেয় হাত তাই লিখে যায়।'

মাধব গম্ভীর হয়ে বলে, 'জবাব দেবার আগে আপনাকে কনসাল্ট করে ভালই হল। আমিও তাই ভাবছিলাম—মানসী হঠাৎ এরকম নত হয়ে কি করে চিঠি লিখল। ভীষণ স্বার্থপর, নিজের স্বার্থের হিসাবটা ঠিক বোঝে। কোন ব্যাপারে কখনো কোনদিন রাগারাগি না করে ধমক না দিয়ে নত করাতে পারি নি। নিজে থেকে নত হয়ে ও এরকম চিঠি লিখল? আপনি না বললে আমি ধরতেই পারতাম না এ চিঠির মানে।'

'আপনাকে কিন্তু এবার একটু নত হতে হবে।'

'কেন? আপনিই বলছেন এ চিঠি মানসী স্বেচ্ছায় নত হয়ে লেখে নি। আমি নত হতে যাব কেন?'

'বৌদি স্বার্থপর হলেও তিনি আপনার স্ত্রী বলে আপনার ছেলেমেয়ের মা বলে নত হবেন। এমনিতেই তো মেয়েরা সব বিষয়ে নত হয়ে আছে—

মান অভিমানের ছেলেখেলায় পুরুষকে একটু নত করতে চাইলে সেটা মানতে হয়।'

মাধব গম্ভীর হয়ে দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে।

অবিরাম টক্ টক্ শব্দ করে ঘড়িটা সময় মেপে চলেছে।

হঠাৎ যেন ধ্যান ভঙ্গ হয়ে মাধব বলে, 'আপনি যাবেন, না আমি যাব?'

'তার মানে?'

'আমি গেলে হয় তো না বুঝে সামান্য এটা ওটা নিয়ে রাগারাগি করে সব ভেঙে দেব। আপনি গেলে আমার দিকটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারবেন, বুঝে শুনে কথা কইতে পারবেন।'

'বেশ তো, আমিই যাব।'

তিনতলা বাড়ী।

গেটে দারোয়ান।

নরেন এসব ব্যাপার জানে।

দরোয়ানকে তোষামোদ করে অন্দরে স্লিপ পাঠিয়ে আধ ঘণ্টা নত হয়ে বসে থাকার বদলে সে সোজাসুজি গট গট করে ভিতরে চলে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে নামছিল মানসীর দিদি অতসী।

তাকে দেখেই নরেনের মনে হয় এত ওজনের গয়নার ভার বয়ে সে কি করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা চলাফেরা করে!

'কে?'

'আমি মাধব বাবুর ছোট ভাই। বৌদির কাছে এসেছিলাম।'

মোটা অতসীর ফর্সা ফাঁপা গালে টোল খেয়ে খুসীতে ফেটে পড়া হাসি ফোটে।

'তেতালায় ডান দিকের ঘরে মানসী শুয়ে আছে।'

নরেনকে দেখেই মানসী বলে, 'আমি জানতাম নিজে আসবে না, আপনাকে পাঠাবে।'

বিছানা থেকে সে মাথা পর্য্যন্ত তোলে না। এপাশ ওপাশ ফেরে না। ভদ্রতা করে নরেনকে বসতে পর্য্যন্ত বলে না।

নরেনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করে, 'অসুখটা কি বৌদি ?'

'নার্ভের অসুখ। অতিরিক্ত চাপ সইতে সইতে বিগড়ে গেছে।'

'তা হলে ভয় নেই। ঠিক হয়ে যাবে।'

'চাপ সইতে হলেও ?'

'চাপ নয়—এবার বিশ্রামের ব্যবস্থা। বলছিলেন যে আপনি জানতেন মাধববাবু নিজে আসবেন না, আমাকে পাঠাবেন নিজে না এসে আমায় কেন পাঠালেন জানেন কি ?'

'জানি বৈকি। নিজে এলে অপমান হত।'

নরেন হেসে মাথা নাড়ে।—'হল না। মাধববাবু আপনাকে ভয় করেন, নিজে আসতে সাহস পেলেন না।'

'তামাসা করছেন ? না ছেলে ভুলোচ্ছেন ?'

'সত্য কথা বলছি। কি বলতে কি বলে বসবেন, এক ভেবে কথা বললে অন্য মানে বুঝে আপনি হয় তো চটে যাবেন—এই ভয়ে প্রথমে আমাকে পাঠালেন।'

মানসী নীরবে চেয়ে থাকে।

নরেন সহজভাবে বলে, 'ছেলেমেয়ে নিয়ে উনি কাল আসবেন—নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন।'

কি সুন্দর সকাল বৈশাখের !

কি আনন্দময় পশুপাখীর জীবন।

জীবন যেন নিজের মধ্যে নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে চারিদিকে কলরব

করে উঠে নিজেকে ঘোষণা করছে আকাশে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়াচ লাগার আগেই।

অর্ধেক রাত কেটেছে ছটফট করে। বড় কষ্টের রাত। হতাশায় বেদনায় ব্যর্থতায় বিষাক্ত করা রাত।

ভোর হবার আগেই নরেন আটকানো দম ছাড়তে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছড়ানো ইঁটের কোটরের মধ্যে হাত পাঁচেক চওড়া পথটার মুক্ত আকাশটুকুর নীচে, খোলা বাতাসে।

কতটুকু আকাশ আর দেখা যায়। কতটুকু বাতাস গায়ে লাগে। কটা আর পশুপাখী গাছের ডালপালা নজরে পড়ে। তবু অনুভব করা যায় চারিদিকে যেন অস্থির চঞ্চল জীবনের স্পন্দন।

বিড়ি সিগারেট কিছুই নেই। তারিণীর হুঁকো কল্কেতে তামাক সেজে নিয়ে বাড়ীর সামনের রোয়াকে বসে তামাক খেতে খেতে জীবন-পথের প্রবীণ স্থবির পথিকের মত নরেন চারিদিকে তাকায় আর নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন?

জীবনে এত দুঃখ কষ্ট ব্যর্থতা হতাশা নিয়েও প্রাণে তার এত আনন্দ কেন? লাথি ঝাঁটা খাওয়া থেঁতলে দেওয়া প্রাণটাতে নিরুপায় হতাশার মেঘ সবটুকুই ঘনিয়ে আছে, সূর্য উঠলে পেটের খিদে মিটোতে এক টুকরো রুটি আজ জুটবে কি না সন্দেহ আছে। তবু কেন গান গেয়ে উঠতে সাধ যায়?

এ্যালুমিনিয়মের একটা কৌটা হাতে নিয়ে হাফপ্যান্ট সার্ট পরা নিকুঞ্জ গট গট করে হেঁটে আসে, জীবন আর জগতের সেই যেন রাজা!

'এত ভোরে?'

'দূর তো কম নয়? আদ্ধেক রাস্তা যেতে যেতেই শ্যামের বাঁশী কলের ভোঁ শুনব।'

চারিদিক ফর্সা হয়ে আসে।

তামাকটুকু শেষ হয়ে এসেছে। আরেক কল্কে যে সেজে আনবে তার উপায়

নেই। এক কল্কে তামাকই বোধহয় আছে—ওটুকু শেষ করলে তারিণী ঘুম থেকে উঠে তামাক না পেয়ে ক্ষেপে যাবে।

পাড়ার তিন বাড়ীর তিনজন ঠিকা ঝি একে একে সামনে দিয়ে চলে যায়। ভুবনবাবুর বাড়ী কাজ করে থুরথুরে বুড়ী নেপার মা। নেপা কবে স্বর্গে চলে গেছে, নেপার মা আজও লোল চামড়া কঙ্কালসার দেহ নিয়ে বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে জীবিকা অর্জন করে বেঁচে আছে।

ধীরে ধীরে কাজ করে। প্রতিদিন অন্তত দশবার ভুবনের স্ত্রী তাকে দূর দূর করে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে।

নেপার মা কোন কথা কানে না তুলে নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

ভুবন আপশোষ করে পাড়ার লোককে বলে, 'কী ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই বলব কি। মাগী খাটতে পারে না, একটা থালা মাজতে আধঘণ্টা লাগিয়ে দেয়, তবু ওটাকেই মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছে। তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। দশ বার বছর কাজ করছে—'

কে যেন বলেছিল, 'আপনার কিন্তু এবার নেপার মাকে না খাটিয়ে পেনসন দেওয়া উচিত।'

ছবিরাণীও কি একদিন এরকম থুরথুরে বুড়ী হয়ে যাবে চাকুরে স্বামীর সংসার করতে করতে? সাতরই বৈশাখ বিয়ে হবে ছবিরাণীর। দিন সাতেক বাকী আছে। ছবিরাণীর কথা ভাবছিল বলেই ছবিরাণী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে নরেন তাকে দেখতেই পায় নি।

ছবিরাণী বলে, 'বাঁচলাম বাবা। এত ভোরে তোমার ঘুম ভাঙ্গে?'

'ঘুম ভাঙ্গে মানে? ঘুম হয় না, ভাঙ্গবে কি! তুমি এত ভোরে?'

'রাতেই হয় তো এসে পড়তাম। তোমায় ডেকে তুলতে হৈ চৈ হাঙ্গামা হবে এই ভয়ে কোনরকমে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।'

'ব্যাপারটা কি?'

'বুঝতে পারছ না? এত ভোরে পাগলের মত ছুটে এসেছি, তবু জিজ্ঞেস করতে হয় ব্যাপার কি? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম—যদি তুমি যাও, যদি আমার মান রাখো। মান খুইয়ে এলাম তবু বুঝতে পারছ না ব্যাপার কি?'

নরেন হুঁকোয় টান দিয়ে পোড়া তামাক থেকে ধোঁয়া বার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, 'বুঝেছি বৈকি। মন ঠিক করেছিল, মনটাকে আবার বেঠিক করেছ।'

সরু রোয়াকে তার পাশে বসে ছবিরাণী হেসে বলে, 'জানো, কদিন শুধু কেঁদে কাটিয়েছি। আমি কখনো কাঁদি না জানো তো? কদিন খালি কান্না আসে, যত চাপতে চাই, যত ভাবি কিছুতে কাঁদব না, তত যেন আরও বেশী করে কান্না আসে। ভেবে পাইনা কেন, কি ব্যাপার। তোমার জন্য নয়, অথচ কান্না পাচ্ছে। কাল বুঝলাম, হিসেবটাতে নিশ্চয় ভুল হয়েছে। একেবারে উল্টো হয়ে গেছে হিসাব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গো। তোমার চাকরী বাকরী নেই বলে কোথায় আরও বেশী করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই করব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম! একেবারে উল্টো হিসাব নয়? কি বোকাই ছিলাম আমি।'

নরেন তার বাঁ হাতটি মুঠো করে ধরে বলে, 'এভাবে এসেই হয় তো বেশীরকম বোকামি করছ!'

ছবিরাণী সমস্ত চোখ মুখ দিয়ে হাসে।

'না। আমি এবার ঠিক বুঝেছি। কাল কি ভাবলাম জানো? ভাবলাম, তোমার চাকরীটা থাকতে থাকতে যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেত? চাকরী গেছে বলে তোমায় তখন কি ছাঁটাই করতে পারতাম? ভেবেই ঠিক করলাম, মান চুলোয় যাক, ভোরে উঠে আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।'